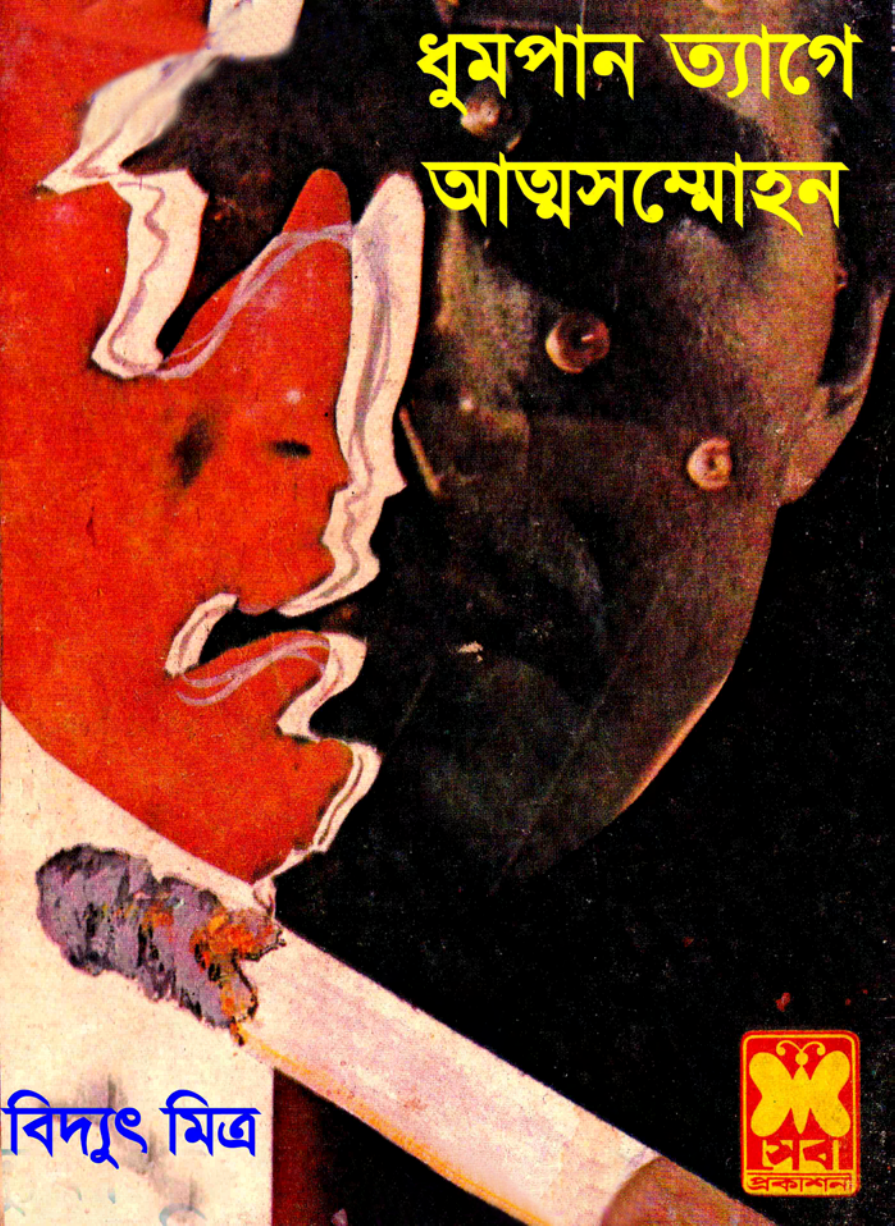

ধুমপান ত্যাগে
আত্মসম্মোহন
বিদ্যুৎ মিত্র
সেবা
প্রকাশনী

ধূমপান ত্যাগে আত্মসম্মোহন

বিদ্যুৎ মিত্র

ধূমপান আপনি ত্যাগ করতে চান। কিন্তু আপনার
দুর্বলসচেতন মন নানান যুক্তিতর্ক খাড়া করে :—
এতদিনের অভ্যাস ছাড়া যাবে না।
এই ছোট্ট আনন্দটুকুই ত রয়েছে জীবনে!
বঞ্চিত হয়ে কি লাভ? খুব বেশী ত আর খাই না।
কি আর এমন খরচ—
এটুকু বাড়তি উপার্জনের ক্ষমতা নেই বুঝি আমার?
তাছাড়া, একেবারে ছেড়ে না দিয়ে কমিয়ে দিলেই ত হয়
কিংবা ফিল্টার-টিপ সিগারেট খেতে পারি।
—এই রকম আরো অনেক খোঁড়া যুক্তি।
কিন্তু প্রচণ্ড শক্তি ধরে আপনার অবচেতন মন।
আত্মসম্মোহনের মাধ্যমে আপনার অবচেতন মনের
সাহায্য নেবেন এবার আপনি।
বিনা কষ্টে, কিংবা খুবই কম কষ্টে উদ্ধার পাবেন
এই জঘন্য বদভ্যাসের নাগপাশ থেকে।
একে অনেক কাজে লাগাবেন আপনি—এমন কি
পরীক্ষা পাশের ব্যাপারেও।

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রূম : ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

তেইশ টাকা মাত্র

ধূমপান ত্যাগে আত্মসম্মোহন

বিদ্যুৎ মিত্র

প্রকাশক :
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা ১০০০

প্রথম প্রকাশ : মে, ১৯৭৫

পঞ্চম মুদ্রণ : এপ্রিল, ১৯৯০

প্রচ্ছদ শিল্পী : শরাফত খান

মুদ্রণে :
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা ১০০০

যোগাযোগের ঠিকানা :
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা ১০০০
জি. পি. ও. বক্স নং-৮৫০
দূরালাপন : ৪০৫৩৩২

শো-রূম :
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

How to Quit Smoking through
Self-Hypnosis
by
Bidyut Mitra

দুটি কথা

ধূমপানের কুফল সম্পর্কে উপদেশবাণী খয়রাতের উদ্দেশ্যে এ বই লেখা হয়নি। আপনাকে সিগারেট ছেড়ে দেয়ার জন্যে সাধা-সাধিও করতে যাব না। আমি জানি ভয় দেখিয়ে কাউকে কোন বদভ্যাসের কবল থেকে মুক্ত করা খুবই কঠিন। তাই ভয়ও দেখাব না। সাদামাঠা তথ্য তুলে ধরা হয়েছে আপনার সামনে—কি করবেন, সে সিদ্ধান্ত আপনার। যদি ছেড়ে দিতে চান, কিভাবে বিনা কষ্টে বা কম কষ্টে ছেড়ে দেয়া যায়, সেটা জানাব আমি।

যাঁরা সিগারেট খান না, তাঁদের ছাড়তে বলার কোন মানে হয় না। যাঁরা খান, কিন্তু ছাড়তে চান না, সত্যিই মজা পান সিগারেট খেয়ে, ক্যান্সার বা আরো সব ভয়ঙ্কর রোগের সম্ভাবনাকে উপেক্ষা করতেই পছন্দ করেন—তাঁদেরকেও আমার বলবার কিছুই নেই।

কিন্তু বেশির ভাগ ধূমপায়ীই ভাবেন—যদি কোনদিন না ধরতাম তাহলে বড় ভাল হত। এখন, যথেষ্ট অভিজ্ঞতার পর ধূমপান সম্পর্কে যে জ্ঞান অর্জন করেছেন, সেটা যদি আগে জানা থাকত, তাহলে কিছুতেই শুরু করতেন না এঁরা। এঁদের মনে গোপন বাসনা রয়েছে, যদি দুই আঙুলে একটা তুড়ি দিলেই ধূমপানের সমস্ত ইচ্ছে উবে যেত বেমালুম, তাহলে বড় ভাল হত। তাহলে বিনা দ্বিধায় ছেড়ে দিতেন সিগারেট। কিন্তু ছাড়তে পারছেন না।

ভয় পান। চেষ্টা করে দেখেছেন, খুবই কষ্ট হয়, দু'চারদিন দাঁতে দাঁত চেপে থাকার পর কষ্ট সহ্য করতে না পেরে আবার খেতে হয়। কি দরকার আবার অত কষ্ট করে বিফল হওয়ার? ছাড়া যাবে না।

আপনি যদি এই দলে পড়েন, আমার এ লেখা আপনারই জন্যে।

পূর্ব অভিজ্ঞতার কথা ভুলে যেতে পারেন আপনি। আগে বাঁশের লাঠি নিয়ে মেশিনগান-ট্যাঙ্কের বিরুদ্ধে লড়তে গিয়েছিলেন, তাই মার খেয়েছিলেন। এবার আপনি মিগ টোয়েন্টিওয়ান নিয়ে আক্রমণ করতে যাচ্ছেন শত্রুকে। জয় আপনার সুনিশ্চিত। অতি সহজে চোদ্দ দিনের যুদ্ধেই পরাজিত করতে পারবেন আপনি শত্রু-কে, বাধ্য করবেন তাকে আত্মসমর্পণে।

প্রচণ্ড ক্ষমতা রয়েছে আপনার অবচেতন মনের। আত্মসম্মোহন এবং উপযুক্ত সাজেশনের মাধ্যমে প্রভাবিত করে সেই মহা ক্ষমতা-শালী শক্তির সাহায্য নেবেন এবার আপনি। অতি সহজে ছেড়ে দিতে পারবেন ধূমপান।

যাঁরা সিগারেট ছাড়তে চান না, কিছুটা কমিয়ে দিতে চান, তাঁরাও উপকৃত হবেন এ-বই থেকে। আত্মসম্মোহন শিখে সাজে-শনগুলোকে একটু পরিবর্তন করে নিজের চাহিদার উপযোগী করে নিয়ে অনায়াসে কমিয়ে দিতে পারবেন বেশ অনেকটা। তবে এ-ক্ষেত্রে কিছুদিন পরই অভ্যাসটা আবার আগের মাত্রায় ফিরে যেতে চায়। সে ব্যাপারে কড়া নজর রাখতে হবে। সেটাও কষ্টকর।

শুধু ধূমপান ত্যাগের ব্যাপারেই নয়, আত্মসম্মোহন শিখে নিয়ে অনেক কাজে ব্যবহার করতে পারবেন আপনি এ বিদ্যা। কিভাবে,

সংক্ষেপে তারও আভাস দিয়েছি যথাস্থানে।

সিগারেট বলতে এ-বইতে আমি বিড়ি, সিগারেট, হুঁকো, চুরুট, পাইপ—মোটকথা ধূমপান বলতে যা যা বোঝায়, সবই বোঝাচ্ছি। আপনি নিজে যেটা খান সেটাই ধরে নেবেন।

আসুন, তাহলে বইটা শুরু করা যাক। দেখাই যাক না সত্যিই উপকার পাওয়া যায় কিনা? চেষ্টা করে দেখতে ক্ষতি কি?

কাজেই, স্মোকারস অফ দা ওয়ার্লড, ইউনাইট। ইউ হ্যাভ নাথিং টু লুজ বাট ইয়োর চেইন-স্মোকিং। বড় জোর বদভ্যাসটা খোয়াতে পারেন, এর বেশি কিছু নয়।

বিদ্যুৎ মিত্র

সূচীপত্র

ছাড়ব কেন?

মুখে স্বীকার করি আর না-ই করি, মনে মনে আমরা সবাই জানি সিগারেট ক্ষতি করছে আমাদের। ছেড়ে দিতে পারলে ভাল হত। আর এ-ও জানি, একবার অভ্যাসটা ভালমত রপ্ত হয়ে গেলে ছেড়ে দেয়া বড়ই মুশকিল। এক-আধবার হালকা ভাবে চেষ্টা করে দেখেছি, বড় শক্ত।

আসলে এর কারণ, সিগারেট কেবল ক্ষতিই করছে না, গোড়াতেই মেনে নেয়া ভাল, বেশ কিছু আনন্দও দিচ্ছে। যদি কেবলই ক্ষতি করত, তাহলে এটা ছেড়ে দেয়া মোটেই কঠিন হত না।—এজন্যে একটা বই লেখারও প্রয়োজন পড়ত না। যদি পরিষ্কার জানি পেনিসিলিন ইঞ্জেকশন নিলেই রি-অ্যাকশন হয় আমার, তাহলে পেনিসিলিন বর্জন করা সহজ কাজ। কিন্তু যদিও জানি চিংড়ী মাছ খেলে ক্ষতি হয় আমার, অ্যালার্জি হয়, ঠোঁট দুটো সাইকেলের টায়ারের মত এবড়োখেবড়ো হয়ে যায়, তবু এক-আধ সময় লোভ সংবরণ করা শক্ত হয়ে পড়ে, চোখ-কান বুজে খেয়ে বসি। কারণ, খেতে মজা লাগে। ইঞ্জেকশন নিতে মজা লাগে না বলে সেটা আমাদের জন্যে কোন সমস্যা নয়, কিন্তু যার অ্যালার্জি আছে তার

জন্যে চিংড়ী মাছ সত্যিই সমস্যা। সিগারেটের ব্যাপারটাও অনেকটা এই রকম। তার উপর রয়েছে নানান ঘোরপ্যাঁচ, নানান উল্টোপাল্টা মতবাদ, নানান ভুল ধারণা। কাজেই এটার আগা-পাশ-তলা বিশ্লেষণের মাধ্যমে ভালমত বুঝে নিয়ে একটা পরিষ্কার সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। যাঁরা ছাড়তে চান না তাঁরাও যে এ-বই থেকে প্রভুত উপকার পাবেন তাতে সন্দেহ নেই। কমিয়ে দিতে পারবেন অনায়াসে।

উপদেশ বণ্টন করবার উদ্দেশ্যে লেখা হয়নি এ-বই, ধূমপায়ীর সমস্যা নিয়ে আলোচনার মাধ্যমে একটা সমাধানে পৌঁছবার চেষ্টা করা হয়েছে। লেখক নিজেও ভুক্তভোগী বলে এতে রয়েছে ব্যক্তিগত ছোঁয়া, আন্তরিক সহানুভূতি।

সিগারেট কেন খাই, খেলে কি ক্ষতি, ছেড়ে দিলে কি লাভ, কিভাবে সহজে ছেড়ে দেয়া যায়, ইত্যাদি প্রশ্নে যাওয়ার আগে, অর্থাৎ এর সাথে মুখোমুখি সংঘর্ষে নামার আগে আমাদের পরিষ্কার ধারণা থাকা দরকার এই পরাক্রমশালী শত্রুর ক্ষমতা এবং আকৃতি-প্রকৃতি সম্পর্কে। বাঘ মারতে গিয়ে যদি তার ক্ষমতা, প্রকৃতি আর আক্রমণ-কৌশল সম্পর্কে আগে থেকে কোন ধারণা না থাকে, তাহলে নিজেরই শিকার হয়ে যাওয়ার সমূহ সম্ভাবনা। সিগারেটের পাঞ্জায় ঠিক কতখানি জোর আছে না জেনে তার সাথে লড়তে যাওয়ার অর্থ অনেকটা অক্টোপাসের কয় হাত-পা আছে না জেনেই তার আলিঙ্গন থেকে মুক্ত হওয়ার চেষ্টার মত। কাজেই সিগারেটের ভাল দিকটা ভালমত বুঝে নেয়া দরকার আমাদের সবচেয়ে আগে, তার ক্ষমতাকে স্বীকার করে নেয়া দরকার, তাহলে মান-

সিক দিক থেকে তৈরি হয়ে যেতে পারব, আত্মবিশ্বাসের সাথে মোকাবিলা করতে পারব শত্রুর।

কাজেই, নড়েচড়ে আরাম করে বসুন। যদি কিছু মনে না করেন, দয়া করে সিগারেট ধরিয়ে নিন একটা। ধরাবার আগে প্যাকেটের গায়ে মমতার সাথে ছুটো টোকা দিয়ে আলগা শুখা ঝরিয়ে নিতে ভুলবেন না, নইলে আবার এক-আধ টুকরো তামাক মুখে গিয়ে আনন্দে ব্যাঘাত ঘটাতে পারে। ফস্ করে ম্যাচ বা ক্লিক করে লাইটারটা জ্বেলে ধরিয়ে নিন ওটা। দেখবেন, আগুনের শিখার মধ্যে সিগারেট ধরাবেন না আবার, একটু উপরে ধরুন, তাতে বারুদ বা পেট্রল বা গ্যাসের গন্ধ এসে ফ্লেভার নষ্ট হবে না। এবার লম্বা করে এক টানে বুক ভরে ধোঁয়া নিয়ে ভুশ করে ছাড়ুন নাক-মুখ দিয়ে।

বাহ! চমৎকার লাগছে, তাই না?

লাগছেই ত। কাজেই, ছাড়বেন কেন?

এই পরিচ্ছেদটা শেষ করবার আগেই হয়ত আরেকটা সিগারেট খাওয়ার ইচ্ছে জাগবে আপনার। যদি তাই হয়, নিশ্চয়ই ধরাবেন আর একটা। নিজেকে বঞ্চিত করবার কোন প্রয়োজন নেই। কারণ এই পরিচ্ছেদটা শেষ করবার পরেও যদি আপনার সিগারেট ছেড়ে দেয়ার ইচ্ছে বজায় থাকে তাহলে বুঝতে হবে জয় আপনার সুনিশ্চিত।

ছেড়ে দেয়ার ইচ্ছেটাই আসল কথা—ওটা থাকলেই আর কোন চিন্তা নেই, নিঃসন্দেহে বলে দেয়া যায় পারবেন আপনি ছাড়তে। আসুন, দেখা যাক সিগারেটের ভাল দিকগুলো শুনিয়ে আপনার

ইচ্ছেটা টলিয়ে দেয়া যায় কিনা।

এই ত বেশ আরাম করে টানছেন, মৃদু টোকা দিয়ে ঝাড়ছেন ছাই, ভালই ত লাগছে—এটা ছেড়ে দিতে গেলে যে মানসিক ও শারীরিক চাপ সৃষ্টি হবে তার মধ্যে যাওয়ার দরকার কি ? যেটা করে মজা পাওয়া যাচ্ছে, স্বেচ্ছায় তা থেকে বঞ্চিত হতে যাবেন কেন ? ছেড়ে দেয়ার পিছনে কি সত্যিই তেমন জোরালো কোন যুক্তি আছে ?

সিগারেটের স্বপক্ষে যুক্তির অভাব নেই। এই আনন্দ বর্জন করলেই কি আপনার বয়স কমে যাবে ? না। আয়ু বাড়বে তার গ্যারান্টি দিতে পারবে কেউ ? না। ক্যান্সার হবে না এমন কথা হলপ করে বলা যায় ? না।

তবে ?

যতই দিন যাচ্ছে জীবনের আনন্দ ততই কমে আসছে আপনার। ছেলেবেলার সেই অকারণ উল্লাস, স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দ ত কবেই গেছে ; দিন যাচ্ছে, 'একে একে নিভিছে দেউটি'। খাওয়া-দাওয়ায় বিধি-নিষেধ আসছে, রমণীর প্রতি পুরুষের স্বাভাবিক আকর্ষণেও ভাটা পড়ছে। আপনার বয়স যদি পঁয়ত্রিশ থেকে পঞ্চাশের মধ্যে হয়, তাহলে আপনার ছুটির সময়টুকুও দখল করে নিচ্ছে নানান সাংসারিক, চাকরিসংক্রান্ত বা ব্যবসায়িক টুকিটাকি প্রয়োজনীয় কাজ। ভুলেই গেছেন আপনি অবসর বিনোদন কাকে বলে। খেলাধূলা ত কবেই শেষ, কবে শেষ শিকারে গিয়েছিলেন, কবে শেষ পিকনিক করেছিলেন, সে-সব এখন স্মৃতি।

কিন্তু রয়েছে কোনটা ? সিগারেট। এই পরিবর্তনশীল জীবনে

বিশ্বস্ত বন্ধুর মত আপনার পাশে থেকেছে, আপনার সুখে-দুঃখে সব সময় সঙ্গ দিয়েছে এই সিগারেটই। এর প্রতি আপনার মমতা বা আসক্তি কমেনি এতটুকু, বরং বেড়েছে দিন দিন। আগে খেতেন দশটা সিগারেট, এখন খান বিশটা, বা চল্লিশটা বা তারও বেশি। মদ না, নারী না, জুয়ো না—এই সামান্য সিগারেটের নেশাটাকেও যদি বর্জন করতে হয় তাহলে জীবনে সুখ বলতে আর থাকল কি?

তাছাড়া খরচই বা এমন কি বেশি। পয়সাটা জোগাড় ত হয়েই যাচ্ছে। এতদিনে কত টাকার সিগারেট খেয়েছেন হিসেব করলে আপনা-আপনি মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসবে: ওরেব্বাপ। কিন্তু কই গায়ে ত লাগেনি। লাগবেও না। সিগারেটের পয়সা ভূতে যোগায়। সিগারেট না খেলেও এত টাকা আপনার হাতে থাকত না, এ ব্যাপারে আপনি নিশ্চিত। ইদানীং বেশ রব উঠেছে, এটা শরীরের পক্ষে দারুণ ক্ষতিকর। কি কি সব ভয়ঙ্কর রোগ হয়। কিন্তু তাই যদি হবে, কোথায়? দিব্যি ত বহাল তবিয়তে বেঁচেবর্তে আছেন। রোগ অবশ্য হতে পারে—অস্বীকার ত আর করছেন না; কিন্তু আপনার কেন হবে?—হলে হবে আর কারো। আর যদি হয়ই, যা হবার তা হয়েই গেছে, এখন ছেড়ে দিলেই কি আটকান যাবে ক্যান্সার?

এর সাথে নাড়ীর যোগ হয়ে গেছে আপনার। শরীর এটাকে গ্রহণ করে নিয়েছে, সহ্য করে নিয়েছে। কাজেই বাজে কথায় কান না দেয়াই ভাল। কেন খামোকা ছেড়ে দিয়ে ভোগান্তি সহ্য করা?

বিভিন্ন পরিবেশে সাহায্য পেয়েছেন আপনি এর কাছে। অপ-

রিচিত লোককে নিমেষে আপন করে নিয়েছেন শুধু একটা সিগারেট অফার করে। ফাইল নড়ছে না, ঠিক জায়গা মত একটা সিগারেটে উদ্ধার হয়ে গেল কাজটা। অস্বস্তিকর সামাজিক আচার-অনুষ্ঠানে নিজের হাত দুটো নিয়ে কি করবেন বুঝতে পারছেন না, ফস্ করে ধরিয়ে ফেলুন একটা সিগারেট, ব্যাস, পেয়ে গেলেন কাজ। মনটা খারাপ, ধরান একটা; হঠাৎ কোন সু বা দুঃসংবাদ পেলেন, ধরান একটা; রাতে ঘুম আসছে না, ধরান। নিরানন্দ জীবনের একমাত্র আনন্দ এই সিগারেট।

ছাড়বেন কেন?

তবে হ্যাঁ—কমাতে পারেন। কমিয়ে দেয়াটা নেহায়েত মন্দ যুক্তি নয়। অনেক সময় ইচ্ছে নেই বা মজা লাগছে না, তবু সিগারেট খাচ্ছেন নিতান্ত অভ্যাসবশে। সেই বাড়তি সিগারেটগুলো বাদ দিতে পারলে মন্দ হয় না। এতে খরচও কমে, ক্ষতির সম্ভাবনাও কমে যায় অনেকখানি। কিন্তু সকালে চায়ের সাথে প্রথম সিগারেটটা…ওটা ছাড়া যায়? বলুন? আহা! পেটটা একটু মোচড় দিয়ে উঠল, খুশিমনে গিয়ে ঢুকলেন বাথরুমে—ওফ্। এ সুখের তুলনা আছে আর? জীবনটাই অর্থহীন হয়ে যাবে না ওটা ছাড়া?

তাছাড়া মাঝে মাঝে কাগজে ত উঠছে সিগারেট খেলে এই উপকার, ঐ উপকার। ওরা কি না জেনেই লিখছে? ক্ষতির কথাও অবশ্য উঠছে—কিন্তু সে ক্ষেত্রে কম করে খেলে বা ফিল্টার টিপ্‌ড খেলেই হয়। একেবারে ছেড়ে দেয়া…উঁহুঁ!

ডাক্তার ত বলবেই, যে-কোন ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করুন বলবে ছেড়ে দেয়াই সবচেয়ে ভাল, তবে একেবারে ছেড়ে দিতে না

পারেন, কমিয়ে দিন। বিদায় নেয়ার সময় হ্যাণ্ডশেক করতে গিয়ে হয়ত লক্ষ্য করবেন ডাক্তারের তর্জনী আর মধ্যমার নখ দুটো খয়েরী হয়ে গেছে সিগারেটের ধোঁয়া লেগে লেগে। কম খেলে অত ঘন দাগ হয় না। খুশি মনে বেরিয়ে আসছেন আপনি ডাক্তারের চেম্বার থেকে। সত্যিই যদি অত ক্ষতিকর হত তাহলে কি আর নিজে খেত ডাক্তার? তাছাড়া আপনি ত কমিয়ে দিতে যাচ্ছেনই, কাজেই আপনার ভয়ের কিছুই নেই।

শুধু ডাক্তার নয় বড় বড় শিল্পী, সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক, নেতা, অভিনেতা, গায়ক—সবাই ত খাচ্ছে। কি ক্ষতিটা হয়েছে তাদের? বরং তামাকের মাহাত্ম্য নিয়ে প্রশস্তি গেয়েছেন চার্লস্ ল্যাম্ব, বায়রণ, কিপলিঙের মত বাঘা সব সাহিত্যিক, বুদ্ধির গোড়ায় ধোঁয়া না দিলে যাঁদের কলম খুলত না।

শুধু সিগারেট খাওয়ার মজা ত আছেই, অন্যান্য আনন্দের সাথেও অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে আছে এটা—চা, কফি, গল্পগুজব, লেখা সবকিছুর সাথে। বিয়ে বাড়িতে ঠেসে খেলেন্ বিরিয়ানী, তারপর যদি একটা পান মুখে দিয়ে সিগারেট না ধরান গেল, অর্ধেক হয়ে যাচ্ছে না খাওয়ার আনন্দ? হুইস্কি বা ভোদকা ত কল্পনাই করা যায় না সিগারেট ছাড়া।

সিগারেট ছাড়া মানে এইসব আনন্দ বিসর্জন দেয়া। কেন দিতে যাবেন? আর এই সেদিন যে দামী লাইটারটা কিনলেন, সেটার কি হবে? দেড়শো টাকা দিয়ে গ্যাস টিউব কিনেছেন—ওটা? এ ছাড়াও নিজের নাম খোদাই করা সিগারেট কেস, সিগারেট হোল্ডার, অনিক্স অ্যাশ-ট্রে—এসব? বিধবা হয়ে যাবে না এরা?

মাথা খারাপ ?

যে-কোন ওস্তাদ ধূমসেবীকে জিজ্ঞেস করে দেখুন বলবে ছেড়ে দেয়ার কথা কল্পনাও করতে পারে না সে। কেন? বহুদিনের চর্চায় শরীর-মন অভ্যস্ত হয়ে গেছে, মেনে নিয়েছে সিগারেটকে, এখন হঠাৎ করে ছেড়ে দিতে গেলে যে মারাত্মক চাপ পড়বে তাতে লাভের চেয়ে ক্ষতিই হবে বেশি। এমন কি নার্ভাস ব্রেক ডাউন পর্যন্ত হয়ে যেতে পারে। এরকম হয়েছে, নজির আছে।

কাজেই বেহুদা ঝুঁকি নেয়ার কি দরকার ?

দেখা যাচ্ছে, সিগারেট ছেড়ে দেয়ার কোন মানেই হয় না। ঝোঁকের বশে চট্ করে ছেড়ে দিলে বাকি জীবন কাটাতে হবে হায় হা-হুতাশ করে। আর সবাই খাবে, মজা পাবে, আপনি একা বঞ্চিত হবেন এ পরম সুখ থেকে। তার চেয়ে মেনে নিন। স্বীকার করে নিন যে আপনি একজন জেনুইন স্মোকার—ব্যাস, চুকে গেল। সব-দিক থেকেই ভাল এটা। ছেড়ে দেয়ার প্রশ্নই ওঠে না। মনের সুখে টেনে যান বাকি জীবন।

যুক্তিগুলো বেশ জোরাল মনে হচ্ছে না ?

এগুলোকে হাল্কা ভাবে নেয়া উচিত নয়—সত্যিই এসব জোরাল যুক্তি।

কিন্তু তবু আপনার মনের কোথাও গোপন একটা বাসনা রয়েছে—যদি ছেড়ে দেয়া যেত, যদি কোনমতে বাঁচা যেত এর নাগপাশ থেকে তাহলে বড় ভাল হত। কমাবার চেষ্টা করে দেখে-ছেন, আবার আগের মাত্রায় ফিরে যেতে হয়েছে আপনাকে। মাঝে মাঝে হাঁপিয়ে ওঠেন, ক্রীতদাসের মত মনে হয় নিজেকে—উপ-

লক্ষ্মি করেন আপনি সিগারেট খাচ্ছেন না, সিগারেটই খাচ্ছে আপনাকে।

এই যদি অবস্থা হয়, তাহলে আসুন, দেখা যাক চাঁদের উল্টো পিঠ। কোন ভয় নেই, চলে আসুন আমার সাথে। যতটা ভাবছেন ততটা কষ্ট হবে না ছেড়ে দিতে। এই পরিচ্ছেদে আমরা কেবল শত্রুর ক্ষমতা সম্পর্কে একটা স্পষ্ট ধারণা করে নিলাম। ওকে চিৎ করে ফেলতে আমাদের খুব একটা বেগ পেতে হবে না।

কোন দাওয়াই, ম্যাজিক বা পানি পড়া নয়—সহজ নিয়মে অনায়াসে ছাড়তে পারবেন এই আত্মধ্বংসী বদভ্যাস। কোন সন্দেহ নেই তাতে। পথ দেখাব আমি, আপনার শুধু ইচ্ছেটা থাকলেই চলবে। আসুন, এগোনো যাক সামনে।

কেন ছাড়ব ?

দেখা যাচ্ছে সিগারেটের স্বপক্ষে অনেক যুক্তি রয়েছে। যুক্তিগুলোর কোনটা সবল কোনটা দুর্বল, কিন্তু সব কটা ফেলনা নয়। এর বিপক্ষেও তেমনি বেশ কিছু অকাট্য যুক্তি রয়েছে। কাজে নামার আগে সেগুলোও আমাদের ভাল মত বুঝে নেয়া দরকার। কোন্‌টাকে কতখানি গুরুত্ব দেবেন, সেটা নির্ভর করবে আপনার ব্যক্তিগত অভিরুচির উপর। আমি সাজিয়ে যাচ্ছি একের পর এক।

প্রথমেই স্বাস্থ্যের কথা ধরা যাক। 'স্বাস্থ্যই সকল সুখের মুল।' আপনার স্বাস্থ্য আপনার কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। ধুমপান আপনার স্বাস্থ্যের ঠিক কি কি ক্ষতি করছে বা করতে পারে সেটা আগামী এক পরিচ্ছেদে বিস্তারিত আলোচনা করা যাবে, সার্জেন জেনারেলের কমিটির রিপোর্টের সংক্ষিপ্তসারও পাওয়া যাবে সেখানে। ওতে একটু নজর বুলালেই বুঝতে পারবেন ধূমপান ঠিক কতটা ক্ষতি করছে আপনার। মানুষ ভাবতে ভালবাসে, অসুখ যদি হয়, আর কারো হবে, আমার নয়। মনকে বোঝাতে চায়, এতদিনেও যখন ভয়ানক কোন অসুখ বেধে যায়নি, আর সম্ভাবনা

নেই—নিশ্চিন্তে খাওয়া যায় সিগারেট। আসলে ধূমপানের ফলে যেসব মারাত্মক রোগ হওয়ার সম্ভাবনা আছে, সেগুলো কিন্তু এক-দিন দুদিনে হয় না, সাধারণতঃ অনেকদিন সিগারেট খাওয়ার পরই জন্মায়। আরো একটা যুক্তি প্রায় শোনা যায়, ক্ষতি যা হওয়ার তা ত হয়েই গিয়েছে, ঝরঝরে হয়ে গেছে ফুসফুসটা, কাজেই এখন ছেড়ে দিয়ে কোন লাভ নেই। এটাও খোঁড়া যুক্তি। গবেষকরা দেখেছেন, ছেড়ে দেয়ার পাঁচ বছরের মধ্যেই ধূমপায়ীর ফুসফুসে মেরামতের কাজ সম্পূর্ণ হয়ে যায়, ক্যান্সারের সম্ভাবনা কমে যায় আশ্চর্যজনক হারে। কাজেই আগামী এক হপ্তার মধ্যে যদি আপনি ছেড়ে দেন, বলা যায় না, অল্প কিছুদিনের মধ্যেই যে মারাত্মক রোগ আপনার বুকে বাসা বাঁধতে যাচ্ছিল, তা থেকে হয়ত বেঁচে যাচ্ছেন চিরতরে। কে জানে, এই মুহূর্তে আপনার সিগারেট ছেড়ে দেয়ার সিদ্ধান্তের উপর আপনার জীবন-মৃত্যু নির্ভর করছে কিনা? ভেবে দেখবেন কথাটা।

নিকোটিন এক মারাত্মক বিষ। আমরা সবাই জানি, দু'চামচ নির্জলা নিকোটিন খেলে মারা যাব নির্ঘাৎ। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে, কমিটির রিপোর্টে এটাকে তেমন ভয়ঙ্কর হিসাবে দেখান হয়নি—এর চেয়েও মারাত্মক ক্ষতিকর আলকাতরা, গ্যাস এবং অন্যান্য কয়েকটা জিনিস রয়েছে সিগারেটে। তবে ছেড়ে দেয়ার সময় নিকোটিনটাই গোলমাল করে সবচেয়ে বেশি। শারীরিক কষ্টটা হয় নিকোটিন-সাপ্লাই বন্ধ হয়ে যায় বলে। সিগারেট খাওয়ার তীব্র ইচ্ছে জাগে শরীর তার চাহিদা জানায় বলে। অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে সে নিকোটিনে। সিগারেট ছেড়ে দেয়ার সাত দিনের মধ্যেই

ধুয়েমুছে সাফ হয়ে যাবে সমস্ত নিকোটিন আপনার শরীর থেকে। খুব দ্রুত মানিয়ে নেবে শরীরটা নতুন অবস্থার সাথে। কাজেই দেখা যাচ্ছে, যেটা ছেড়ে দেয়ার সময় সবচেয়ে বেশি কষ্ট দেবে আপনাকে, সেটাই বশ্যতা স্বীকার করবে আপনার কাছে সবার আগে। ওকে ভয় পাওয়ার কিছুই নেই।

খরচের ব্যাপারটাও কিন্তু নেহায়েত অবজ্ঞা করবার মত বিষয় নয়। দৈনিক চাহিদা মেটানটা খুব একটা খরচার ব্যাপার নয় ঠিকই, কিন্তু একটু লম্বা সময়ের হিসেব করলে বিরাট একটা অঙ্ক দাঁড়িয়ে যাবে। যাঁরা রথম্যান বা স্টেট এক্সপ্রেস খান তাঁদের কথা ছেড়েই দিলাম, দিনে যিনি পাঁচ টাকার সিগারেট খান তিনি আগামী ত্রিশ বছরে এর পিছনে খরচ করছেন চুয়ান্ন হাজার টাকা; যিনি দশ টাকার খান, তিনি একলক্ষ আট হাজার টাকা। সেই সাথে রয়েছে ম্যাচ বা লাইটারের খরচ, সেটাও নিতান্ত কম নয়। আপনি যদি ভুলো মানুষ হন, এখানে ওখানে ম্যাচ বা লাইটার হারানর অভ্যাস থাকে, তাহলে ত কথাই নেই। আপনি সৌখিন মানুষ হলে এর সাথে যোগ করুন দামী সিগারেট কেস, সিগারেট হোল্ডারের খরচ, অ্যাশট্রের খরচ।

সিগারেট ছেড়ে দেয়ার সাথে সাথেই বন্ধ হয়ে যাচ্ছে এই বাজে খরচগুলো। একসাথে লাখ টাকা হাতে পাচ্ছেন না ঠিকই, কিন্তু এই বেঁচে যাওয়া টাকাগুলো আপনারই ভোগে লাগছে—আর কারো নয়। সেই সাথে বন্ধ হচ্ছে দামী কাপড়ে জ্বলন্ত সিগারেট থেকে আগুনের ফুল্কি পড়ে ফুটো হয়ে যাওয়া, ঘুমের ঘোরে ঠোঁট থেকে জ্বলন্ত সিগারেট খসে গিয়ে লেপ তোষকে আগুন লাগা,

সিগারেটের আগুনে ছ্যাঁকা খেয়ে গায়ে ফোস্কা ওঠা। আপনার হয়ত জানা আছে, যেখানে যত আগুন ধরেছে তার শতকরা তেত্রিশ ভাগ ক্ষেত্রে কারণটা সিগারেট। এটা ছেড়ে দিয়ে আপনি হয়ত আপনার প্রিয়জনকে আগুনে দগ্ধ হয়ে মৃত্যু বরণ করা থেকে বাঁচাচ্ছেন—কে জানে!

আপনার যদি শিশু সন্তান থাকে তাহলে সিগারেট ছেড়ে দেয়া আপনার জন্যে অবশ্য কর্তব্য। আপনি নিশ্চয়ই চান না আপনার ছেলেটাও এই বদভ্যাসের নাগপাশে আটকা পড়ুক? নিশ্চয়ই চান না আপনার মতই দাসত্ব করুক ও এই কুৎসিত নেশার, ভয়ঙ্কর রোগে অকাল মৃত্যুর সম্ভাবনা থাকুক ওর জীবনে? নিজের জীবন নিয়ে আপনি যা খুশি তাই করতে পারেন, কিন্তু ওর সম্ভাবনাময় জীবন নিয়ে পারেন না। যদি তাই হয়, তাহলে ওর ভবিষ্যতের কথা ভেবে ছেড়ে দিতে হবে আপনার। ছেলেমেয়েরা বাপ-মার অনুকরণ করবেই। ওরা বড় হয়ে বাপ-মার মত হতে চায়। মনস্তত্ত্বে একে বলে আইডেন্টিফিকেশন। আপনাকে সিগারেট খেতে দেখলে আপনার সন্তানের মনের মধ্যে গেঁথে যাবে, বড় হতে হলে সিগারেট খেতে হয়, বড় হলে সে-ও সিগারেট খাবে। বিশ্বাস না হয় ওকে জিজ্ঞাসা করে দেখুন।

যাই হোক, সিগারেট বাদ দেয়ার সাথে সাথে অনেকগুলো শারীরিক পরিবর্তনও লক্ষ্য করবেন আপনি। প্রথম রাত্রেই দেখবেন কি চমৎকার ঘুম হয়—এত আরামের ঘুম আপনি গত কয়েক বছরে ঘুমিয়েছেন কিনা সন্দেহ। হার্টের থেকে থেকে থির থির করে কেঁপে ওঠা বন্ধ হয়ে যাবে। ডিসপেপশিয়া, বুকজ্বালা উবে

যাবে বেমালুম। দাঁতগুলো ঝকঝকে দেখাবে, এমন কি শরীরের রঙও খানিকটা পরিষ্কার ঠেকবে অন্যের চোখে। বছরের এমাথা ওমাথায় সর্দি-কাশি-ফ্লু বন্ধ হয়ে যাবে। ছেলা ঠোঁট আর খশখশে জিভের যন্ত্রণা থেকে রেহাই পাবেন। মাথা ধরার আক্রমণ কমে যাবে আশ্চর্যজনক ভাবে। সর্বক্ষণ বুকে কফ জমে থাকবে না। খিদে বাড়বে—সেই সাথে টের পাবেন হজম শক্তি বেড়ে গেছে আপনার কয়েকগুণ।

এসব মোটেই বাড়িয়ে বলা নয়। সিগারেট ছেড়ে দিয়েছে এমন যে-কোন লোককে জিজ্ঞেস করে দেখুন—একটি কথাও বাড়িয়ে বলিনি।

আঙুল থেকে নিকোটিনের দাগ মুছে যাবে এক সপ্তাহের মধ্যে। খাবারের সত্যিকার স্বাদ কাকে বলে ভুলে গিয়েছিলেন আপনি কর্কশ ধোঁয়ার অত্যাচারে—তিন দিনে ফিরে আসবে সেটা। প্রতিদিন সাত-আটশো টান তামাক পোড়া ধোঁয়া টেনে নাক বলে যে একটা ইন্দ্রিয় আছে সেটা প্রায় ভুলতে বসেছিলেন আপনি, সিগারেট ছেড়ে দেয়ার ঠিক তৃতীয় দিনে হারান নাক ফিরে পাবেন আপনি। দেখবেন গন্ধ বলে অদ্ভুত একটা জিনিস আছে পৃথিবীতে—বাগানে হাঁটলে ফুলগুলো শুধু দেখতেই পাচ্ছেন না, তার গন্ধও আসছে নাকে, বাসায় ফিরেই টের পেয়ে যাচ্ছেন গিন্নী আজ কি রান্না চড়িয়েছেন।

কাজেই দেখা যাচ্ছে, সিগারেট ছেড়ে দিয়ে কেবলই বঞ্চিত হচ্ছেন, আত্মাকে কষ্ট দিচ্ছেন তা মোটেই নয়; যা পাচ্ছেন সেটাও কম নয়। এখন হয়ত বিশ্বাস হতে চাইবে না, কিন্তু সিগারেট ছেড়ে

দেয়ার সুবিধেগুলো একবার ভাল মত উপলব্ধি হয়ে গেলে দেখবেন কিছুতেই চাইবেন না আপনি আগের অবস্থায় ফিরে যেতে।

শুধু এই নয়, সিগারেট ছেড়ে দিলে আপনার কাপড়-চোপড়, কাগজপত্র, ডেস্ক বা টেবিল ক্লথ আর ছাই পড়ে নোংরা হচ্ছে না। নিয়মিত নোংরা দুর্গন্ধযুক্ত অ্যাশট্রে পরিষ্কারের ঝামেলা থাকছে না। স্নায়বিক উত্তেজনা কমে যাচ্ছে। ছেড়ে দেয়ার পর প্রথম কিছুদিন অবশ্য বেশ উত্তেজিত থাকবেন, একটুতেই মেজাজ খারাপ হয়ে যাবে, কিন্তু অল্পদিনেই কমে যায় এসব, ক্রমে দূর হয়ে যায়। অবাক হয়ে যাবেন আপনি হঠাৎ কোন উত্তেজক ঘটনার মোকাবিলা করতে গিয়ে কি আশ্চর্য স্থির থাকতে পারছেন আপনি—চট্ করে পকেটে হাত দিতে হচ্ছে না সিগারেটের জন্যে।

শান্ত, ঠাণ্ডা একটা ভাব আসবে আপনার মধ্যে। মনে হবে, হঠাৎ যেন হাতে সময় বেশি পাচ্ছেন। সিগারেট ধরাতে গিয়ে প্যাকেট থেকে পছন্দসই সিগারেটটা বেছে বের করা, প্যাকেট বন্ধ করা, ম্যাচের জন্যে পকেট হাতড়ান, আগুন ধরান (এসবে দৈনিক আধ ঘণ্টা সময় ব্যয় হয় আপনার) ইত্যাদির আর দরকার হচ্ছে না বলে যে সময় পাচ্ছেন, তা নয়। সিগারেট না খেতে পেরে যে কষ্ট হচ্ছে, তার জন্যে যে প্রলম্বিত হচ্ছে সময় তাও নয়। কষ্ট আসলে যতটা হবে ভাবা যায়, ততটা হয় না, এবং যতটুকু হয় সেটাও খুব দ্রুত দূর হয়ে যায়। আসলে যখন বারবার সিগারেট টেনে নিজের স্বাভাবিক শক্তি ও উদ্যমকে খর্ব করা বন্ধ করছেন, তখন হঠাৎ করে বল্গাহারা ঘোড়ার মত শক্তির জোয়ার এসে যাচ্ছে আপনার মধ্যে, যে-কোন কঠিন কাজ সহজ মনে হচ্ছে আর এই

জন্যেই আপনার মনে হচ্ছে আগের চেয়ে সময় পাচ্ছেন অনেক বেশি।

দুটো ভুল ধারণা সম্পর্কে এখানেই বলে নেয়া দরকার। অনেকের ধারণা, সিগারেট ছেড়ে দিলেই মোটা হয়ে যাবেন। রুগ্নদের জন্য এটা সমস্যা না হয়ে সুবিধেই হচ্ছে, কিন্তু মোটা মানুষের জন্যে এটা রীতিমত দুশ্চিন্তার বিষয়। আসলে খিদে অনেক বাড়বে ঠিকই, কিন্তু ইচ্ছে করলেই আগের সম-পরিমাণ খেয়েও তৃপ্ত হতে পারেন আপনি খাবারটা অনেকক্ষণ মুখের মধ্যে রেখে অনেকক্ষণ ধরে চিবিয়ে খেলে। এতে স্বাদ পাওয়া যায় বেশি, হজমেরও সুবিধে হয়, মোটা হয়ে যাওয়াও ঠেকান যায়। তাছাড়া আপনার মধ্যে সিগারেট ছেড়ে দেয়ার সাথে সাথেই যে বাড়তি এনার্জির জোয়ার আসছে, সেটা স্থির থাকতে দেবে না আপনাকে—এটা ওটা সেটা করতে বাধ্য হবেন—ফলে বাড়তি চর্বি গলে গিয়ে ফিগারটা মানানসই হয়ে আসবে। আরেকটা ভুল ধারণা হচ্ছে, সিগারেট ছেড়ে দিলে কোষ্ঠ পরিষ্কার হবে না। এটাও সম্পূর্ণ বাজে কথা। প্রথম একদিন-দু'দিন, বড়জোর তিনদিন একটু অসুবিধে হতে পারে, কিন্তু খিদের তাড়নায় যা খাবেন সেটা পেটের মধ্যে চুপচাপ বসে থাকতে পারবে না কিছুতেই, ওটাকে বেরোতেই হবে। নতুন নিয়মে অভ্যস্ত হতে তিনদিনের বেশি সময় নেবে না আপনার শরীর। আর তেমন অসুবিধে দেখলে একরাত্রে জোলাপ নিলেই চুকে যাচ্ছে সমস্যা। কাজেই বাজে কথায় কান দেবেন না।

এই বদভ্যাসের আলিঙ্গন থেকে বেরিয়ে যেতে পারলে প্রত্যেকবার বাইরে বেরোবার আগে পকেট থাবড়ে দেখতে হবে

না আপনার সিগারেটের প্যাকেট আর ম্যাচটা ফেলে যাচ্ছেন কিনা, অনেক রাতে বাসায় ফিরে 'হায় হায়! সিগারেট কিনতে ভুলে গেছি!' বলে আবার ছুটতে হবে না এক মাইল দূরের দোকানে। সর্বক্ষণ সজারুর মত ঝমঝম ম্যাচের আওয়াজ করে হাঁটতে হবে না, আনাড়ীর মত ফুলে থাকবে না পকেট। যেখানে যাচ্ছেন সেখানেই অ্যাশট্রে চাইতে হবে না, পকেট উল্টে ঝুরঝুরে তামাকের গুঁড়া ফেলতে হবে না। গুরুজনের সামনে লজ্জায় পড়তে হবে না। কোনো কারণে ঘণ্টা দুয়েক বিরত থাকতে বাধ্য হলে যে কষ্ট পেতেন, তা থেকে রেহাই পাচ্ছেন। সিগারেট ছাড়তে পারছেন না বলে মাঝে মাঝে যে তীব্র অনুশোচনা হয় আপনার মধ্যে, তা থেকে মুক্তি পাচ্ছেন চিরতরে।

মোট কথা, এর হাত থেকে নিষ্কৃতি পেলেই আপনার কাছে পরিষ্কার হয়ে যাবে সিন্দাবাদের ভূতের চেয়েও কত ভয়ঙ্কর এক ভূত নেমে গেছে আপনার কাঁধ থেকে। অবাক হয়ে ভাববেন, এতদিন কি করে সহ্য করেছেন এই জঘন্য বদভ্যাসটাকে।

সিগারেট ছেড়ে দিয়ে এত যে সুখ-সুবিধে হচ্ছে আপনার, যুক্তিগুলো যথেষ্ট জোরাল মনে হচ্ছে, কিন্তু আসলে অর্ধেকেরও কম বলেছি আমি।

কেন ছাড়বেন তার আরো জোরাল যুক্তি রয়েছে। আসুন, সেসব নিয়েও খানিক আলোচনা করা যাক। ভয় নেই—এক্ষুণি ছেড়ে দিতে বলছি না আপনাকে। কথা দিয়েছি, সহজে ছেড়ে দিতে পারবেন—সে পথও দেখাতে পারব, ইনশাল্লাহ্।

কেন খাই ?

প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ লোক কোটি কোটি সিগারেট পুড়াচ্ছে, ভুশ ভুশ ধোঁয়া ছাড়ছে রেল এঞ্জিনের মত। কিন্তু কেন? কেন এই খরচ, কষ্ট, দাসত্ব? কেন কখনো ম্লান, কখনো অম্লান বদনে এতোগুলো মানুষ মেনে নিচ্ছে এই শারীরিক নির্যাতন—কাশি, ঘুমহীনতা, গলা খুশখুশ, দুরারোগ্য ব্যাধির সম্ভাবনা?

খুব কম লোকেই তলিয়ে দেখেছে আসল কারণটা। জিজ্ঞেস করলে উত্তর হবে—ভাল লাগে, তাই খাই। কিম্বা—অভ্যাস হয়ে গেছে। কিম্বা—সবাই খায়, আমিও খাই—ক্ষতি ত দেখছি না; একটা কিছু নিয়ে ত থাকতে হবে।

সত্যিই কেন খায় মানুষ? কি করে সিগারেট শতকরা তেপ্পান্ন জন লোকের মুখে রাশ পরিয়ে নিজের কব্জায় নিয়ে এল সেটা একটু বুঝে নেয়া দরকার।

নানান কারণে মানুষ সিগারেট ধরে, কিন্তু একটু ভেবে দেখলেই বোঝা যায় গোড়ার কথা হচ্ছে সামাজিক মর্যাদা। দলের আর সবার মধ্যে স্থান করে নিতে চাইছে সে। অল্প বয়সে যারা ধরছে

তারা অনুকরণ করছে বড় ভাই, বাবা বা তার কল্পনার অন্য কোন নায়ককে। বড়রা যেটা করে সেটা ক'রে নিজেকে বড় এবং চালু ভেবে আত্মতৃপ্তি লাভ করছে। এটা ফুলপ্যান্ট, ঘড়ি বা চশমার মতই আকর্ষণ করছে শিশুর মনকে। তাছাড়া যেখানেই নিষেধ সেখানেই দ্বিগুণ মজা। সিগারেট খাওয়ায় আসলে মজা নেই, মজাটা নিষিদ্ধ কিছু করায়। পাশের বাড়ির পেয়ারা গাছ থেকে পেয়ারা চুরি করার মত, পিছন থেকে টিচারকে মুখ ভ্যাংচানর মত আনন্দ। কৌতূহলও কাজ করছে এর পিছনে, অনুশাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহও কাজ করছে। রীতিমত চালু ছেলে হিসেবে মর্যাদা লাভ হচ্ছে সমবয়সীদের কাছে।

তাছাড়া সামাজিক চাপ রয়েছে। সিগারেট খায় না এমন কাউকে সিগারেট অফার করে দেখুন, রীতিমত সঙ্কোচের সাথে লজ্জিত ভাবে মাথা নাড়বে—যেন খায় না বলে তাকে আপনি আনস্মার্ট, কৃপণ বা মেয়েলিমানুষ মনে করতে পারেন। অথবা অস্বাভাবিক চড়া গলায় নিষেধ করবে ড্যাম কেয়ার ভাব নিয়ে। এটা তার ইনফিরিওরিটি কমপ্লেক্সেরই বহিঃপ্রকাশ। সামাজিক চাপের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণার মত। সহজ, স্বতঃস্ফূর্ত, চালু হিসেবে সবার কাছে স্বীকৃতি পেতে হলে সিগারেট খেতে হবে আপনাকে। একটা দুটো খেতে খেতে হয়ে পড়তে হবে অভ্যাসের দাস।

কারণ, সিগারেটের ধোঁয়ায় শুধু যে ভয়ঙ্কর বিষ নিকোটিন রয়েছে তা নয়, এতে রয়েছে কার্বন মনোক্সাইড, কিছুটা হাইড্রোসায়ানিক অ্যাসিড, পাইরিডাইন, এবং নানান ধরনের ফেনল ও অ্যালডেহাইড। যখন সিগারেট টানছেন এইসব যাচ্ছে আপনার

মুখে, ফুসফুসে—ফলে আপনার শরীরের অভ্যন্তরে কয়েকটা ব্যাপার ঘটতে শুরু করছে। স্নায়ুগুলো উত্তেজিত হয়ে উঠছে কিছুক্ষণের জন্যে, লালা আসছে মুখে, ব্লাডপ্রেশার বেড়ে যাচ্ছে, হার্ট বিট বাড়ছে। হাত কাঁপতে শুরু করছে মৃদু ভাবে, হাত-পায়ের আঙুলের প্রান্ত-গুলো অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে। অভ্যস্ত ধূমপায়ীর এসব লক্ষ্য করবার কথা নয়, কিন্তু ল্যাবরেটারিতে টেস্ট করে জানা গেছে শরী-রের মধ্যে এইসব পরিবর্তন ঘটছে প্রতিবার সিগারেট খাওয়ার সাথে সাথে। এবং ফলে রক্তবাহী নালীগুলো ছোট হয়ে যাচ্ছে—অনেকটা বাগানে পানি দেয়ার হোজ পাইপ পা দিয়ে চেপে ধরার মত।

লাগাম টেনে ধরা হচ্ছে আপনার।

সিগারেট খাওয়ার সাথে সাথে যে উত্তেজনা বোধ করছেন, তারপরই আসছে অবসাদ। আপনার শরীরের সিমপ্যাথেটিক ও সেণ্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম এবং মোটর নার্ভের প্রান্তগুলো অবসন্ন হয়ে পড়ছে।

ফলে কি ঘটছে?

প্রতিবার ধূমপানের সাথে সাথেই আপনার শরীরের স্বাভাবিক কর্মশক্তির লাগাম টেনে ধরছেন আপনি। চালু গাড়ির ব্রেক চেপে ধরার মত, কিম্বা দুর পাল্লার দৌড় প্রতিযোগীর পায়ে সীসার তৈরি জুতো পরিয়ে দেয়ার মত।

হঠাৎ আকস্মিক কোন ঘটনার সম্মুখীন হলে—যেমন, বাঘা চেহারার এক কুকুর তাড়া করেছে, আপনি প্রাণপণে ছুটছেন—আপনার শরীরের মধ্যে পরিবর্তন এসে যায় সাথে সাথেই। আপ-

নার রক্তের সাথে অ্যাড্রেনালিন এসে মিশতে শুরু করেছে, পেশী-গুলো দৃঢ় হয়ে গেছে, দ্রুত-শ্বাস-প্রশ্বাস চলছে, কারো কারো আবার কান দুটো একটু খাড়া হয়ে যায়—অর্থাৎ মুহূর্তের মধ্যে আপনার শরীর তৈরি হয়ে যাচ্ছে আত্মরক্ষার (প্রয়োজন হলে আক্রমণের) জন্যে। এই মুহূর্তে আপনি নার্ভাস, ক্ষিপ্র, উত্তেজিত, আক্রমণোদ্যত। মানসিক বা আবেগজাত কারণে আপনার মধ্যে উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা ও উত্তেজনা দেখা দিলেও শরীরের মধ্যে এই ঘটনা-গুলো ঘটে থাকে।

সিগারেটের ধোঁয়া সেই মুহূর্তে লাগাম টেনে ধরেছে আপনার, কিছুটা শান্ত করছে আপনাকে। তাই স্নায়বিক উত্তেজনার সময় ভাল লাগছে আপনার সিগারেট। সত্যিই একটা সিগারেট তখন আপনাকে বেশ কিছুটা সাহায্য করছে। শরীরটা যখন জরুরী অব-স্থার মোকাবিলার জন্যে তৈরি হয়ে যাচ্ছে, অথচ কাজে নামার বা আক্রমণ করবার সুযোগ অনুপস্থিত, তখন একটা সিগারেট শান্ত করছে আপনাকে, অবসন্ন করছে। ঠিক প্রয়োজনের সময়েই যদি আপনি একটা করে সিগারেট খেতেন তাহলে তা নিয়ে দুশ্চিন্তার কিছুই ছিল না, বরং সেটা আপনার জন্যে ভালই হত। কিন্তু তা করেন না আপনি। প্রতিদিন বিশ থেকে ষাটটা সত্যিকার আক-স্মিক ঘটনা ঘটে না কারো জীবনে। অথচ আপনি বিশ থেকে ষাট বার সিগারেট ধরিয়ে শান্ত, অবসন্ন করছেন নিজেকে।

কেন? অভ্যাস। একটা অভ্যাসে বাঁধা পড়েছেন আপনি। আপনার শরীরটা অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে, কিছুক্ষণ অন্তর অন্তর আশা করছে এই অবসাদ, না পেলে দাবি জানাচ্ছে। দাবি পূরণ করতে

হচ্ছে আপনার, জোগাড় রাখতে হচ্ছে সিগারেটের। খেয়ে যে খুব মজা পাচ্ছেন, উপভোগ করছেন, তা নয়—অভ্যস্ত হয়ে যাওয়ায় না খেলে কষ্ট হচ্ছে। আনন্দের জন্যে খাচ্ছেন না, কষ্ট থেকে রেহাই পাওয়ার জন্যে খাচ্ছেন।

দিনে ত্রিশটা সিগারেট খাওয়ার অর্থ প্রতি আধ ঘণ্টায় একটা করে খাওয়া, চল্লিশটা খাওয়ার অর্থ প্রতি চব্বিশ মিনিটে একটা করে খাওয়া—যদি ধরে নিই আট ঘণ্টা ঘুমাচ্ছেন। প্রতিদিন এত-গুলো সঙ্কটজনক অবস্থার সৃষ্টি হয় না, এতবার নিজেকে বোঝাবার দরকার পড়ে না যে আপনি বড় হয়েছেন, কিম্বা এত ঘন ঘন আনন্দের প্রয়োজন হয় না। আসল কথা আপনার শরীরটা দাবি জানাচ্ছে বলেই খেতে হচ্ছে আপনাকে। অভ্যস্ত করে ফেলেছেন দেহকে, আর কিছুই নয়।

ভাল লাগে তাই খাই—কথাটা আসলে ছেলেমানুষী কথা। পাকা ধূমপায়ী কোনদিন বলবে না সিগারেট খাচ্ছে মজার জন্যে। মজা সে পাচ্ছে না, মজা টের পাচ্ছে।

সিগারেটের ধোঁয়া কাঠ-খড়-পাতার ধোঁয়া থেকে খুব একটা আলাদা কিছু নয়। শীতের সন্ধ্যায় হাঁটা পথে বাড়ি ফেরার সময় দূর থেকে ভেসে আসা কাঠ-পোড়া ধোঁয়ার গন্ধ চমৎকার লাগে, কিম্বা বিকেল বেলা মাঠে বেড়াতে গিয়ে পাতা-পোড়া ধোঁয়ার উদাস গন্ধ নাকে এলে মনে পড়ে যায় ছেলেবেলার হেমন্তের কথা, অপূর্ব লাগে—সত্যি। কিন্তু সেই ধোঁয়ার মধ্যে নাক গুঁজে শ্বাস টানলে আধ মিনিটেই ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়বে প্রাণটা। সিগারেটের ধোঁয়াও দূর থেকে চমৎকার সুগন্ধি, কিন্তু যে পরিমাণ ধোঁয়া রোজ

গলাধঃকরণ করছেন তাতে মজার ভূত পালিয়ে বেঁচেছে বহু আগেই।

পরীক্ষা করে জানা গেছে তামাক জিনিসটা কোনদিনই আফিম বা কোকেনের মত নেশায় পরিণত হয় না। নেশা নয়, অভ্যাস। সকালে উঠে দাঁত মাজা বা বাইরে বেরোবার আগে চুল আঁচড়ানর মত অভ্যাস।

ভেবে দেখেছেন, ঠিক কতটা আরাম পাচ্ছেন আপনি সিগারেট খেয়ে? খিদের সময় এক থাল ভাতের মত আরাম দেয়? কিম্বা মাঘের শীতে লেপ মুড়ি দেয়ার মত আরাম হয়? নিজেই বুঝুন, হয় না। মজা নেই—এটা এখন প্রয়োজন হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রথম সিগারেটের কথা মনে করুন—মাথাটা ঘুরে উঠেছিল না? ধ্বক করে কর্কশ ধোঁয়া ধাক্কা দিয়েছিল বুকের ভিতর? বিচ্ছিরী লেগেছিল না? সেই একই জিনিস তো টানছেন আপনি রোজ বিশ থেকে চল্লিশ-পঞ্চাশ বার। সহ্য হচ্ছে কি করে? শরীরের নাম মহাশয়, যা সহাইবেন তাহাই সয়—এ এক আশ্চর্য মেশিন। কিন্তু এরও সহ্যের একটা সীমা আছে।

না, মজা এতে নেই। বিজ্ঞাপনে যাই বলুক, যতক্ষণ না এর কর্কশ ধোঁয়া শরীরকে দিয়ে সইয়ে নিচ্ছেন, কোনই মজা নেই সিগারেট খাওয়ায়। সামান্য একটু অবসাদ বোধের খাতিরে শরীরের উপর এতটা অত্যাচার অতিরিক্তই হয়ে যাচ্ছে।

ডলারের সরকারী রেট যদি ধরা যায়, সেই হিসেবে তিনশো কোটি টাকা খরচ করছে আমেরিকার টোবাকো কোম্পানিগুলো প্রতি বছর শুধু বিজ্ঞাপনে। টাকা ওরা নিশ্চয়ই পানিতে ফেলছে

না। বিক্রি থেকে কি পরিমাণ লাভ বের করে নিচ্ছে বুঝতেই পারছেন। করুক। সিগারেট কোম্পানির দোষ দিয়ে কোন লাভ নেই। মিথ্যে লোভ দেখাচ্ছে ঠিকই, কিন্তু ওদের চেয়ে দোষ বেশি খরিদ্দারদের। আপনি যদি অতিরিক্ত কমলা খেয়ে পেটে অসুখ বাধান সেটা কমলাওয়ালার দোষ নয়। দোষ আপনার।

নিজের সাবধান হতে হবে। কিন্তু এই সাবধান হওয়ার ব্যাপারে আপনার কোন সমব্যথী নেই, জানবেন। আপনার বন্ধু-বান্ধব যারা সিগারেট খাচ্ছে তাদের বলে দেখুন, ছেড়ে দিতে চান—তারা একবাক্যে বলবে, ছেড়ে দিতে পারলে ভাল হত, কিন্তু পারা যাবে না, চেষ্টা করে দেখেছে ভয়ানক কষ্ট···অসম্ভব। যারা খায় না তাদের বলুন—তারা বলবে, কি করে যে মানুষ এসব ছাইপাঁশ খায় সেটা তাদের বোধের অগম্য। কারো কাছে সহানুভূতি বা সাহায্য পাওয়ার আশা নেই। এ পাপ-মুক্ত হতে হবে আপনাকে সম্পূর্ণ নিজের চেষ্টায়। চলতে হবে একা।

রেগেমেগে দাঁত কিড়মিড় করে সব সিগারেট ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে হঠাৎ সিদ্ধান্ত নিলে ভুল করবেন। এক ঘণ্টা দু'ঘণ্টা, একদিন কি দু'দিন থাকতে পারবেন, তারপর আবার মাথা নিচু করে লজ্জিত ভঙ্গিতে ধরাতে হবে সিগারেট। একে আক্রমণ করতে হবে ভালমত জেনে শুনে বুঝে নিয়ে। কাজেই এখুনি হুট করে কিছু করে বসবেন না দয়া করে।

খরচের জন্যে নয়—যদিও প্রচুর পয়সা বেঁচে যাবে আপনার সিগারেট ছেড়ে দিলে; স্বাস্থ্যের জন্যেও ঠিক ততটা নয়—যদিও পরিষ্কার ভাবে প্রমাণিত হয়েছে সিগারেট দুরারোগ্য ব্যাধির কারণ;

অপরাধ বা অন্যায় করছেন বলে নয়—যদিও সত্যিই অন্যায় করছেন আপনি আপনার সন্তানের প্রতি ; ছাড়বেন, কারণ আপনি মনের গভীরে উপলব্ধি করেন জিনিসটা নীরবে দোহন করে চলেছে আপনাকে বছরের পর বছর। আপনি সিগারেট খাচ্ছেন না, সিগারেটই খাচ্ছে আপনাকে। আপনি মজা পাচ্ছেন না, ওটার অভাবে কষ্ট পাচ্ছেন বলে কষ্ট এড়াচ্ছেন। ক্রীতদাসে পরিণত হয়েছেন আপনি। ধীরে ধীরে তোষামোদ করে কেড়ে নিয়েছে ওটা আপনার ঘুম, স্বাভাবিক কর্মক্ষমতা, শক্তি, সুখ, স্বাস্থ্য, সময়। নিজেকে অপরাধী মনে হয় আপনার ওই জঘন্য বদভ্যাসের দাসত্ব করছেন বলে।

এর আগে আপনি হয়ত একাধিকবার চেষ্টা করেছেন সিগারেট ছেড়ে দেয়ার। ভুল পন্থা অবলম্বন করেছিলেন বলে সফল হননি। এখানে সংক্ষেপে দু'একটা ভুল নিয়ম সম্পর্কে আলাপ করে নেয়া দরকার।

রেগেমেগে হঠাৎ ছেড়ে দেয়াটা সবচেয়ে খারাপ। হঠাৎ একদিন বিতৃষ্ণা এসে গেল আপনার সিগারেটের উপর, ঘেন্না ধরে গেল। এটা হয় সাধারণতঃ কোন কারণে অনেক রাত জাগতে হলে। রাত জাগলে সিগারেট খাওয়া পড়ে অনেক বেশি, ফলে ঠোঁট ছিলে জিভ জ্বলে বিচ্ছিরি এক অবস্থা হয় সকালে উঠে। তখন আর সিগারেট খেতে ভাল লাগে না, রাগ চড়ে যায় মাথায়। ঘোষণা করে দিলেন, জীবনের আর স্পর্শ করছেন না আপনি সিগারেট। প্যাকেটে যে ক'টা ছিল হাতের মুঠোয় চেপে ভেঙে গুঁড়িয়ে ফেলে দিলেন বাথরূমে। ব্যাস, খতম। কিছুতেই খাবেন না আপনি আর। এই অটল সিদ্ধান্ত কয়েক ঘণ্টা খুব জোরের

সাথেই বলবৎ থাকে, কিন্তু ঠোঁট আর জিভের জ্বালাপোড়া একটু কমলেই ভিতর থেকে আকুলি-বিকুলি শুরু হয়ে যায় আবার সিগারেট খাওয়ার জন্যে। খানিক ছটফট করার পর নরম হয়ে আসে মনটা। ইচ্ছেটা আর একটু চেগিয়ে উঠলেই শার্ট গায়ে দিয়ে বেরিয়ে পড়ছেন আপনি দোকানের উদ্দেশ্যে, লাজুক হাসি হেসে ধরাচ্ছেন একটা। খুব ভাল ঠেকছে না প্রথম সিগারেট, কিন্তু তেমন খারাপও লাগছে না। হেরে গেলেন আরেকটা খণ্ডযুদ্ধে।

মার্ক টোয়েনের বক্তব্য: সিগারেট ছেড়ে দেয়া খুব সহজ—কতবার ছাড়লাম! তিনি এই রকম ছাড়া ছেড়েছেন হাজার বার।

সিগারেট কমিয়ে দেয়াও প্রায় একই কথা। সারাদিনে একটা নির্দিষ্ট সংখ্যক সিগারেট খাবেন বলে সিদ্ধান্ত নিয়ে বসলেন একদিন—পাঁচটা, বা দশটা; তার বেশি কিছুতেই খাবেন না আপনি। অথবা স্থির করলেন, আজ খাবেন বিশটা, কাল উনিশটা, পরশু আঠারটা—এইভাবে কমাতে কমাতে নিয়ে আসবেন পাঁচে। কল্পনা হিসেবে এই নিয়মটা চমৎকার, একেবারে কাঁটায় কাঁটায় মিলে যায় হিসেব, কিন্তু বাস্তবে প্রয়োগ করা বড়ই কঠিন। সারাদিন আর কোন চিন্তা করা যায় না সিগারেটের চিন্তা ছাড়া। বার বার ঘড়ির ওপর চোখ যাবে—আরেকটা খাওয়ার সময় হল? বার বার গুণতে হবে—প্যাকেটের মধ্যে রইল আর ক'টা? বারবার দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভুগবেন—এখন খাওয়া ঠিক হবে, না এটা জমাবেন পরবর্তী কোন সময়ের জন্যে? ভোগান্তির একশেষ। বড় জোর দিন কয়েক চালু থাকবে এই আত্ম-অনুশাসন। তারপর হয় বিরক্ত হয়ে বাদ দেবেন ঘড়ি-ঘণ্টার হিসেব, নয়তো হঠাৎ কোন জরুরী অবস্থা

এসে হাজির হবে—হাওয়ায় উড়ে যাবে এই নিয়ম। হয়ত মনে মনে স্থির করবেন, জরুরী অবস্থাটা কাটিয়ে উঠেই আবার ফিরে যাবেন আগের নিয়মে—কিন্তু সেটা আর হয়ে উঠবে না কোন-দিনই।

বাজি ধরে সিগারেট ছাড়া হচ্ছে আর একটা বাজে পদ্ধতি। এটা রীতিমত শাস্তি। অনেকে মোটা অঙ্কের টাকা বাজি ধরে জিতেছে, শোনা যায়; কিন্তু এখানে একটা সময়সীমা থাকে সব সময়েই। একমাস কি দু'মাস বা তিনমাসের মধ্যে সিগারেট খেলে হেরে যাচ্ছেন আপনি, না খেয়ে থাকতে পারলে জিতছেন। এখানে সিগারেট ছাড়াটা আসল কথা নয়, হেরে যাওয়ার ফলে যে লোক-সান হচ্ছে, এবং জিতলে যে লাভটা হচ্ছে সেটাই আসল অনু-প্রেরণা। লোকসানটা যদি অতিরিক্ত মোটা অঙ্কের হয় তাহলে নির্ধারিত সময় পর্যন্ত কষ্ট করে হলেও টিকে যেতে পারে অনেকে, কিন্তু যেই মাত্র জয় হয়ে গেল ওমনি একটা সিগারেট ধরাবে সে। ঠিক সেইদিন যদি না-ও ধরায় তিনদিনের মধ্যে আবার শুরু করবে, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

এভাবে সিগারেট ছাড়া যায় না।

তাহলে কিভাবে যায়?

সেই প্রসঙ্গেই আসব আমরা একটু পরে। আমার কথাবার্তায় এতক্ষণে নিশ্চয়ই আপনি টের পেয়ে গেছেন, আমার জানা আছে সিগারেট খেতে কেমন লাগে। খশখশে জিভ আর জ্বলা ঠোঁট নিয়েও, সর্দিকাশি আর মাথা ধরা নিয়েও কেন মানুষ খায় সিগা-রেট। ছেড়ে দিলে কেমন লাগে। নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন, জেনে-

শুনেই কথা বলছি আমি, ভরসা রাখা যায় আমার উপর। খানিক বাদেই কাজে নামব আমরা। ভয়ের কিছুই নেই। এক্ষুণি ছাড়তে বলছি না আপনাকে। নার্ভাস লাগলে ধরিয়ে নিন একটা। আগামী পরিচ্ছেদে সার্জেন জেনারেলের কমিটির রিপোর্টের উপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে আমরা চলে যাব অবচেতন মন এবং আত্মসম্মোহনের প্রসঙ্গে। ততক্ষণ নিশ্চিন্তে টানুন সিগারেট—কোন বাধা নেই।

সার্জেন জেনারেলের কমিটি রিপোর্ট

সিগারেট ছেড়ে দেয়া খুব সহজ কাজ নয়। জোরাল ইচ্ছে ছাড়া এই বদভ্যাসের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় না। নিজের ভেতর ছেড়ে দেয়ার স্বপক্ষে যত জোরাল তাগিদ সৃষ্টি করবেন ততই সহজ হবে কাজটা। এতক্ষণ সেই চেষ্টা করেছি আমরা, এখনো সেই চেষ্টাই চলছে। কেন ছাড়বেন সে-যুক্তি যত জোরাল হবে ততই সুবিধে। কাজেই এই পরিচ্ছেদটাকে অবহেলা করা ঠিক হবে না।

স্বাস্থ্য একটা মস্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। কেউ চায় না রোগাক্রান্ত হতে—বিশেষ করে লাঙ-ক্যান্সারের মত ভয়ঙ্কর রোগেআক্রান্ত হতে। উটপাখির মত বালিতে মাথা গুঁজে 'কেউ দেখতে পাচ্ছে না' ভাবাটা যতখানি হাস্যকর, আপনার ক্যান্সার হবে না, হলে হতে পারে অন্য কারো—ভাবাটাও তেমনি হাস্যকর। তবু নিজের অসুখ হতে পারে এই সম্ভাবনাটা মানুষ উড়িয়ে দিতেই পছন্দ করে। ভাবতে ভালবাসে আর যারই হোক—আমার হবে না।

সিগারেটের স্বপক্ষে-বিপক্ষে তর্কের ঝড় যখন তুমুল আকার

ধারণ করল, তখন দশ সদস্য বিশিষ্ট একটা কমিটি তৈরি করা হল আমেরিকায়। শীর্ষস্থানীয় নামজাদা ডাক্তারদের নিয়ে তৈরি হল এই কমিটি, টোবাকো কোম্পানিগুলোও স্বীকার করে নিল এঁদের রায় দেয়ার যোগ্যতা। চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্যাথোলজী, বায়োকেমিস্ট্রি, সার্জারী, ফার্মাকোলজী, ইণ্টারন্যাল মেডিসিন, ইত্যাদি বিভিন্ন শাখা থেকে নেয়া হল এঁদের। এঁরা কয়েক বছর ধরে বিশদ বিচার বিবেচনা করলেন ধূমপানের ফলাফল। মানুষ ও জানোয়ারের উপর ধূমপানের কি প্রভাব, সে-সম্পর্কে আট হাজার বিভিন্ন ধরনের ব্যাপক গবেষণার ফলাফল পরীক্ষা করে দেখলেন, চুলচেরা বিশ্লেষণ করলেন।

এতে দেখা গেল, এতদিন যেটা মারাত্মক ক্ষতির কারণ বলে মনে করা হত, সেই নিকোটিন আসলে ততটা ক্ষতি করছে না, যতটা করছে বিষাক্ত গ্যাস, আলকাতরা, ইত্যাদি সিগারেটের ধোঁয়ার অন্যান্য জিনিসগুলো। জানা গেল, পাইপ ও চুরুটে যদিও লাঙ-ক্যান্সারের সম্ভাবনা অপেক্ষাকৃত কম—এসব খেলে লিপক্যান্সারের সম্ভাবনা আবার বেড়ে যায়।

আট হাজার রিসার্চের মধ্যে একটি পরিচালনা করেছিলেন আমেরিকান ক্যান্সার সোসাইটির চীফ সংখ্যাগাণিতিক ডঃ ই. কায়লার হ্যামণ্ড। চল্লিশ থেকে উননব্বই বছর বয়সের চার লক্ষ বাইশ হাজার বিভিন্ন পেশার বিভিন্ন ধরনের লোককে পরীক্ষা করে যে তথ্য সংগ্রহ করা গেল সেগুলো কমপিউটারের সাহায্যে বিশ্লেষণ করে জানা গেল চাঞ্চল্যকর সংবাদ। যাঁরা ধূমপান করেন না তাঁদের চাইতে যাঁরা ধূমপান করেন তাঁদের মৃত্যুর হার দ্বিগুণ,

লাঙ-ক্যান্সারে মৃত্যুর হার নয়গুণ। অর্থাৎ একজন অ-ধূমপায়ীর চেয়ে আপনার লাঙ-ক্যান্সারে মৃত্যুর সম্ভাবনা নয়গুণ বেশি। ভয়াবহ নয়? শুধু ডঃ হ্যামণ্ডের রিসার্চই নয়, আরো অসংখ্য গবেষণার ফলাফল বিশ্লেষণ করে এই একই তথ্য বেরিয়ে এসেছে।

১৯৬৪ সালের জানুয়ারী মাসে ব্যাপক বিশ্লেষণের পর কমিটির রিপোর্ট প্রকাশ করা হল। এখন আর কারো মনে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই যে লাঙ-ক্যান্সার, ব্রঙ্কাইটিস, এম্‌ফিসেমা এবং হার্ট ডিজিজের জন্যে বিরাট অংশে দায়ী ধূমপান।

ফিল্টার টিপ সিগারেট ক্ষতি কম করে বলে টোবাকো কোম্পানিগুলোর যে দাবি ছিল, সেটাও ভিত্তিহীন বলে নাকচ করে দিয়েছে কমিটি। ফিল্টারের ফলে এইসব রোগের সম্ভাবনা কমছে না আপনার।

কমিটির রিপোর্ট জানার পর যে-কোন বুদ্ধিমান লোক এক বাক্যে স্বীকার করবে সিগারেট ছেড়ে দেয়া উচিত। কিন্তু উচিত বলে মনে করা আর ছেড়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়ার মধ্যে অনেক তফাৎ আছে। মনে মনে জানছেন ছেড়ে দেয়া উচিত, অথচ ছেড়ে দিতে চাইছেন না বা শক্ত সিদ্ধান্ত নিতে পারছেন না, এই অবস্থা মনের মধ্যে বিচ্ছিরি এক দ্বন্দ্বের সৃষ্টি ক'রে ছেড়ে দেয়াটাকে অযথা আরো কঠিন করে তোলে। দ্বিধাহীন চিত্তে আপনার মনোস্থির করতে হবে খাবেন কি খাবেন না। যদি ছেড়ে দিতে চান, নিজের মধ্যে ছেড়ে দেয়ার প্রবল ইচ্ছে এবং প্রচণ্ড তাগিদ তৈরি করতে হবে। প্রথমে যুক্তি তর্কের সাহায্যে, তথ্য প্রমাণের সাহায্যে আপনার চেতন মনকে আগ্রহী করে নিয়ে আমরা আপনার অবচেতন

মনের দিকে হাত বাড়াব। সেখান থেকেও সাহায্য আসবে। ফলে অনেক সহজ হয়ে যাবে আপনার পক্ষে এর হাত থেকে মুক্তি লাভ করা।

কমিটির রিপোর্টের সার-সংক্ষেপ

নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয়েছে ধূমপান লাঙ-ক্যান্সারের কারণ। সম্ভাবনার কম-বেশি নির্ভর করে কতক্ষণ ধরে কতগুলো সিগারেট খাওয়া হয় তার উপর। ধূমপানের ফলে ল্যারিংক্স, ইসোফ্যাগাস ও ব্লাডারের ক্যান্সারও হতে পারে।

ধূমপান ক্রনিক ব্রংকাইটিসের প্রধান কারণ। পালমোনারি এমফিসেমার সাথেও এর সম্পর্কের প্রমাণ পাওয়া গেছে। কাশি, কফ ও শ্বাস কষ্টের প্রধান কারণ ধূমপান। ইনফ্লুয়েঞ্জা ও নিউমোনিয়ায় মৃত্যুর সম্ভাবনাও বাড়ে এর ফলে। তবে ধূমপান অ্যাজমার কারণ বলে কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

পুরুষ ধূমপায়ীদের করোনারী আর্টারী ডিজিজে মৃত্যুর হার অ-ধূমপায়ীদের চেয়ে অনেক বেশি। পেপটিক আলসারেরও আভাস পাওয়া গেছে, এবং লিভারের সিরোসিস রোগে মৃত্যুর হার বেশি দেখা গেছে।

পোয়াতি স্ত্রীলোক যাঁরা সিগারেট খান, দেখা গেছে তাঁদের সন্তানের ওজন অপেক্ষাকৃত কম।

ধূমপানের সাথে অগ্নিদগ্ধ হয়ে আকস্মিক মৃত্যুর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে।

অবচেতন মন

প্রায় সবাই জানে ভিতরের মন বলে একটা জিনিস রয়েছে সবার মধ্যে, নানান জনে নানান নামে ডাকে এটাকে—অবচেতন, অচে-তন, সাবজেকটিভ, সাবলিমিনাল, ইড, কত কি। আমরা এটাকে অবচেতন মন বলব। দার্শনিক বাকবিতণ্ডা এড়িয়ে যত শীঘ্র সম্ভব ঢুকে পড়ব আমরা কাজের কথায়।

সম্মোহনকে বুঝতে হলে অবচেতন মন সম্পর্কে কিছুটা জেনে রাখা দরকার। দুঃখের বিষয় আজ পর্যন্ত খুব বেশি কিছু জানা যায়নি এর সম্পর্কে। এর গতি প্রকৃতি আজও রহস্যাবৃত। শুধু জানা গেছে এই মনটা আমাদের প্রেরণা, আবেগ ও প্রবৃত্তিকে অনেক-খানি নিয়ন্ত্রণ করছে। আরো জানা গেছে, এর সাথে যোগাযোগের সবচেয়ে সহজ মাধ্যম হচ্ছে সম্মোহন। যেহেতু আপনার সিগারে-টের চাহিদা অনেকখানি আসছে অবচেতন মন থেকে, এর সাথে আলাপ আলোচনার প্রয়োজন পড়বে আপনার। সেটা সম্ভব হবে আত্মসম্মোহনের মাধ্যমে।

অবচেতন মনের একটা কাজ হচ্ছে শরীরের অভ্যন্তরীণ কাজ-কর্ম নিয়ন্ত্রণ করা। অটোনমিক নার্ভাস সিস্টেমের মাধ্যমে এটা আমাদের অভ্যন্তরীণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এবং গ্ল্যাণ্ডের উপর প্রত্যক্ষ প্রভাব বিস্তার করতে পারে।

সম্মোহিত অবস্থায় সাজেশন দিয়ে রক্ত চলাচল, হার্টবিট, শরীরের তাপ বাড়ান বা কমান যায় খুবই সহজে, জখম সারিয়ে তোলা যায় দ্রুত, গ্ল্যাণ্ডগুলোর কাজের ধারা পরিবর্তন করা যায়। রাশিয়ান মনস্তত্ত্ববিদ কে প্ল্যাটোনভের 'সাইকোলজি অ্যায ইউ মে লাইক ইট' বইয়ের পঁয়ত্রিশ পৃষ্ঠায় একটা হাতের ফটোগ্রাফ রয়েছে —হাতের উপর একটা ফোস্কা। সম্মোহিত অবস্থায় সেই হাতের উপর একটা ধাতুর মুদ্রা ঠেসে ধরে শুধু বলা হয়েছিল ওটা প্রচণ্ড গরম, সাথেসাথেই ফোস্কা উঠে গেল জায়গাটায়।

অবচেতন মনের গতি-প্রকৃতি চেতন মন থেকে আলাদা। এর কাজ কারবার সোজা-সাপ্টা, মারপ্যাচের ধার ধারে না। কোন কোন ক্ষেত্রে শিশুর মত, যা বলা হচ্ছে তাই বুঝবে, অন্তর্নিহিত মানে খুঁজবে না। সচেতন ভাবে আমরা অনেক সময় এক কথা বলে আরেক কথা বোঝাই, এর কাছে ওসব চলবে না।

সম্মোহিত অবস্থায় অবচেতন মনটা উঠে আসে উপরে। সচেতন কোন লোককে যদি জিজ্ঞেস করেন, 'কিছু যদি মনে না করেন, আপনি কোন্ স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করেছেন বলবেন?' —তাহলে উত্তরে স্কুলের নামটা বলবেন ভদ্রলোক। ওটাই স্বাভাবিক। তিনি ধরে নিচ্ছেন আপনি স্কুলের নামটা জানতে চাইছেন। কিন্তু গভীরভাবে সম্মোহিত কোন লোককে যদি এই প্রশ্ন করেন,

উত্তর আসবে—'হ্যাঁ' কিম্বা 'বলব'। এটাই যথার্থ উত্তর। তিনি রাজি আছেন স্কুলের নামটা বলতে। যা বলছেন; ঠিক তাই বুঝছে অবচেতন মন, ব্যাখ্যা করছে না।

আমরা বড় হওয়ার সাথে সাথে অনেক বিষয় সম্বন্ধে সচেতন ভাবে ধারণা পাল্টাই। অবচেতন মনেরও তেমনি পরিবর্তন হয়, কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এটা শৈশবের ধ্যান ধারণা আঁকড়ে ধরে রাখে। শৈশবে বড় কোন ঘটনা ঘটে থাকলে সেই ঘটনাটাকে আপনার অবচেতন মন শৈশবের দৃষ্টিভঙ্গিতেই দেখবে। ছোট বেলায় আরশোলা, মাকড়সা, ব্যাঙ বা টিকটিকি দেখে ভয় পেয়ে থাকলে সেই ভয়টা বড় হয়েও রয়ে যায়। চেতন মন বুঝতে পারছে ওগুলো ভয়ানক কিছু নয়, কিন্তু তবু আতঙ্কিত হচ্ছে মানুষ অবচেতন মনে শৈশবের দৃষ্টিভঙ্গিটাই রয়ে গেছে বলে।

আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে চেতন মন অনেক কিছু ভুলে যায়, কিন্তু অবচেতন মন ভোলে না কিছুই। ধূমপানের ব্যাপারে এমন অনেক ঘটনা, স্মৃতি রয়েছে যা আপনার চেতন মন ভুলে গেছে। কিন্তু সে সব ঠিকই কাজ করে যাচ্ছে আপনার অবচেতন মনে। হয়ত আঙুল চোষার বিকল্প হিসেবে আপনি সিগারেট টেনে চলেছেন। শিশু অবস্থায় আদর যত্ন ভাল লেগেছে, হয়ত সেই স্মৃতিও কিছুটা জড়িত আছে আপনার ধূমপানের সাথে। হয়ত শৈশবের কোন আবেগের ছোপ লেগে আছে সিগারেটের গায়ে, কে জানে।

অবচেতন মনের আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হচ্ছে আপনাকে রক্ষা করা। সদা সতর্ক রয়েছে এটা, আপনি জেগে থাকুন বা ঘুমিয়ে থাকুন বা অজ্ঞান অবস্থায় থাকুন—বিশ্বস্ততার সাথে কাজ

করে যাচ্ছে আপনার অবচেতন মন, সজাগ রয়েছে বিপদ-আপদের হাত থেকে আপনাকে রক্ষা করবার জন্যে।

এই সোজা-সরল অবচেতন মনের সাহায্য নিতে পারলে সিগারেট ছেড়ে দেয়া আপনার পক্ষে অনেক সহজ হয়ে যাবে। আগেই বলেছি অবচেতন মনের সাথে যোগাযোগ করতে হলে সম্মোহনের সাহায্য খুব কাজে লাগবে আপনার। সেটা হিটারো-হিপনসিস বা অপর কারো সাহায্যে সম্মোহিত হলেও হতে পারে, সেলফ্-হিপনসিস বা আত্মসম্মোহনের দ্বারাও হতে পারে। আত্ম-সম্মোহন একবার শিখে নিলে এটাকে শুধু সিগারেট ছাড়ার কাজেই নয়, নানান ধরনের আত্মোন্নয়নের কাজেও ব্যবহার করে উপকৃত হতে পারবেন। তাই ব্যাপারটা ভালমত বুঝে নেয়া দরকার।

প্রথম কথা, এতে ভয়ের কিছুই নেই। এ সম্পর্কে যুগযুগ ধরে অনেক ভুল ধারণা চলে আসছে। অনেকের ধারণা, কারো দ্বারা সম্মোহিত হলেই বুঝি তার মুঠোর মধ্যে চলে যেতে হচ্ছে, তার ইচ্ছের দাসে পরিণত হচ্ছে মানুষ। আসলে তা হয় না কখনো। সব সম্মোহনই আসলে আত্মসম্মোহন। আপনি ইচ্ছে না করলে কেউ আপনাকে সম্মোহিত করতে পারবে না। সম্মোহিত অবস্থা-তেও আপনার ইচ্ছের বিরুদ্ধে কেউ কিছু করাতে পারবে না আপ-নাকে দিয়ে। হিপনটিস্ট আপনাকে আত্মসম্মোহিত হতে সাহায্য করেন মাত্র—আর কিছু নয়। ম্যাজিশিয়ানরা স্টেজে যা দেখান তার বেশির ভাগই সম্মোহন নয়, নিছক হাতসাফাই।

চিকিৎসা শাস্ত্র কিছুদিন আগে পর্যন্ত সম্মোহনের প্রতি বিরূপ ধারণা পোষণ করেছে—একে বিজ্ঞানসম্মত প্রক্রিয়া বলে স্বীকার

করে নেয়নি। কিন্তু এখন অবস্থার বিরাট পরিবর্তন হয়ে গেছে।

কয়েক বছর আগে ব্রিটিশ মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন একটা কমিটি নিয়োগ করেছিল চিকিৎসা শাস্ত্রে সম্মোহনের উপকারিতা পরীক্ষা করে দেখার জন্যে। বিষয়টি নিয়ে ভাল মত পর্যালোচনা করবার পর এই কমিটি রিপোর্ট পেশ করে। কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী সম্মোহন বিদ্যা চিকিৎসা শাস্ত্রের একটা প্রয়োজনীয় কৌশল হিসেবে অনুমোদন লাভ করে এবং বিভিন্ন মেডিকেল কলেজে এই বিদ্যা শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করা হয়।

১৯৫৮ সালে আমেরিকান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনও অনুরূপ কমিটি নিয়োগ করে তার রায় অনুযায়ী স্বীকৃতি দিয়েছে সম্মোহনকে। আজ সম্মোহন চিকিৎসা শাস্ত্রের একটা প্রয়োজনীয় অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে। শুধু মনস্তাত্ত্বিক চিকিৎসাতেই নয়, আজ সম্মোহন ব্যবহৃত হচ্ছে সার্জারী, দন্ত চিকিৎসা, ম্যাটারনিটি—সব ক্ষেত্রেই।

নাটক-নভেল, সিনেমা-টেলিভিশনে অবাস্তব নাটকীয় ঘটনা পড়ে এবং দেখে সাধারণ মানুষ সম্মোহনকে ভয়ের চোখে দেখতে অভ্যস্ত হয়েছে বলেই এই প্রসঙ্গে এত কথার উত্থাপন। আসলে আত্মসম্মোহনের ফলে ক্ষতি হয়েছে এমন প্রমাণ আজ পর্যন্ত কেউ হাজির করাতে পারেনি। শুধু একটা সাবধানতা অবলম্বনের কথা সবাই একবাক্যে স্বীকার করে নেয়—সেটা হচ্ছে সময়সীমা। নির্ধারিত সময়ের জন্যে সম্মোহিত হওয়া উচিত। বিশেষ করে ব্যথা দূর করবার ব্যাপারে সময়সীমা একান্ত জরুরী। কারণ, যে-কোন ব্যথার একটা মানে আছে। শরীরের কোথাও ব্যথা হওয়া মানে

প্রাকৃতিক নিয়মে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে, শরীরের কোথাও গোলমাল হয়েছে, নজর দেয়া দরকার। পেটে যন্ত্রণা অ্যাপেণ্ডিসাইটিসের জন্যেও হতে পারে। সেই অবস্থায় আপনি যদি সম্মোহনের সাহায্যে ব্যথা দুর করে দিব্যি ঘুরে ফিরে বেড়ান, অ্যাপেণ্ডিক্স ফেটে মারা পড়া বিচিত্র নয়। কিম্বা ঘন ঘন মাথা ধরছে আপনার, সম্মোহনের সাহায্যে দুর করে দিলেন ব্যথা—কে জানে. হয়ত ব্রেন টিউমারকে এইভাবে ভুলে থাকছেন আপনি। কাজেই সম্মোহনের সাহায্যে অঙ্গ অবশ বা ব্যথা উপশম করতে হলে নির্দিষ্ট একটা সময়ের জন্যে করা উচিত। এছাড়া আর তেমন কোন বিধি-নিষেধ নেই।

সম্মোহিত হওয়ার যোগ্যতা

সবাই সম্মোহিত হতে পারে না। শতকরা পাঁচজন মানুষ হাজার চেষ্টা করেও সম্মোহিত হতে পারবে না। কিন্তু বাকি পঁচানব্বই ভাগ সহজেই হাল্কা, মাঝারি বা গভীর স্তরে পৌঁছে যেতে পারে সামান্য চেষ্টাতেই।

কিন্তু প্রায় সবারই ধারণা তার বুঝি সম্মোহিত হওয়ার যোগ্যতা নেই। এদেশে বিশিষ্ট মনস্তত্ত্ববিদ ও হিপনটিস্ট প্রফেসার এম, ইউ, আহমেদ (ঢাকা কলেজের প্রাক্তন পিন্সিপ্যাল) বলছিলেন তাঁর অভিজ্ঞতার কথা। বেশির ভাগ লোকই নাকি প্রথমে ঘোষণা করে যে তাকে সম্মোহিত করা খুব কঠিন হবে—মনটা খুব শক্ত তার। এই সব লোকেরাই নাকি চট্ করে গভীর স্তরে চলে যায়, আর যারা সন্দেহপ্রবণ, মিনমিনে স্বভাবের লোক, তাদের সম্মোহিত করা সত্যিই কঠিন কাজ।

বিদেশী হিপনটিস্টদের অভিজ্ঞতাও এই একই রকম। সুস্থ, সবল মনের অধিকারী সহজে সম্মোহিত হয়। বুদ্ধির সাথেও এর সম্পর্ক রয়েছে। বুদ্ধিমানেরা সহজে সম্মোহিত হতে পারে। কিন্তু গর্দভ বা পলাতক মনোবৃত্তির লোকেরা কিছুতেই হতে পারে না। সাজেশনের প্রতি মনোযোগই দিতে পারে না তারা। অবশ্য ব্যতিক্রম যে নেই, তা নয়। আরো অনেক কিছুর উপর নির্ভর করে ব্যাপারটা। ভয় বা সন্দেহ থাকলে সম্মোহিত হওয়া কঠিন, তাছাড়া সম্মোহনকারীর যোগ্যতাও একটা বড় কারণ।

শিশুরা খুব সহজে সম্মোহিত হতে পারে। সমালোচনা ছাড়াই

যে-কোন সাজেশন গ্রহণ করতে তারা অভ্যস্ত—নইলে দ্রুত শেখা যায় না। এটা কি, ওটা কি, জিজ্ঞেস করে ওরা সর্বক্ষণ, উত্তরে যা বলা যায় একেবারে উদ্ভট কিছু না হলে মেনে নেয়। কলম, বালিশ, চচ্চড়ি, আম, জাম, ঘাম যেটাকে যা বলছেন মেনে নিচ্ছে ওরা—শিখে নিচ্ছে। যা বোঝান যায় তাই বোঝে। আমার ছেলে-টার মুখে সর্বক্ষণ খৈ ফুটছে গালির। যেখানে যেটা শুনেছে সযত্নে জমা করে নিয়েছে নিজের শব্দ ভাণ্ডারে। ওর প্রিয় গালি ছিল—কুত্তার বাচ্চার বাচ্চার বাচ্চার বাচ্চা। ওর ধারণা যত বাচ্চা বলবে ততই কঠিন হবে গালিটা। ওকে বোঝালাম যত বাচ্চা হবে ততই ছড়িয়ে যাবে ওটা; ভাগ হয়ে যাবে অনেক বাচ্চার মধ্যে, নরম হয়ে যাবে গালির জোর। টপ্ করে মেনে নিল। এখন আমাকেই শুধু চতু-ষ্পদে পরিণত করছে, আমার বাপ-দাদাকে আর টানাটানি করছে না।

এই মেনে নেয়ার ক্ষমতা রয়েছে বলেই শিশুদের সম্মোহিত করা সহজ। ছয় থেকে আট বছরের শিশু সম্মোহনের জন্যে সব-চেয়ে ভাল সাবজেক্ট। তারপর থেকেই ক্ষমতাটা কমে যেতে থাকে বয়েসের সাথে সাথে। বেশি বয়স্ক মানুষকে সম্মোহিত করা খুবই কঠিন। ত্রিশের পর থেকে মানুষের মনের গ্রহণ ক্ষমতা দ্রুত কমতে থাকে।

অঙ্কের হিসেব করলে দেখা যাবে প্রতি বিশজনের মধ্যে এক-জন সম্মোহিত হবে না কিছুতেই, বাকি উনিশজন কম বেশি হবে। সম্মোহনের মাধ্যমে আমরা যে সব আত্মোন্নয়নমূলক কাজে হাত দিতে চাই সেগুলোর জন্যে হাল্কা সম্মোহনই যথেষ্ট। এটা ভরসার

কথা। সোমনামবিউলিস্টিক বা গভীরতম স্তরে পৌঁছতে পারে মাত্র শতকরা আট থেকে দশ জন। মাঝারী স্তরে যেতে পারে শতকরা ষাট জন, হাল্কা স্তরে শতকরা পঁচানব্বই জন।

আত্মসম্মোহনেরও এই একই হিসেব।

আপনি ঠিক কোন্ দলে পড়বেন সেটা বুঝবার নিয়ম আছে, সেসব নিয়ে পরে আলোচনা করা যাবে। তবে মোটামুটি ভাবে ধরে নিতে পারেন, অন্ততঃ হাল্কা ভাবে সম্মোহিত হতে আপনি পারবেন।

সম্মোহন

সম্মোহনের সাহায্যে কি কি সম্ভব আমরা মোটামুটি জানি, কিন্তু সম্মোহন জিনিসটা আসলে কি তার সন্তোষজনক ব্যাখ্যা আজ পর্যন্ত দিতে পারেনি কেউ? ব্যাপারটা অনেকটা ইলেকট্রিসিটির মত। জিনিসটা কি তা আজো জানা সম্ভব হয়নি—কিন্তু দিব্যি ব্যবহার করছি আমরা সেটা, কাজে লাগিয়ে উপকৃতও হচ্ছি। এটাকে বর্ণনা করা যায় এভাবে: এটা একটা পরিবর্তিত চেতন অবস্থা, চিন্তাভাবনাগুলো এই সময় আসছে সরাসরি অবচেতন মন থেকে। এমন এক বিশ্রামের অবস্থা, যখন মনটা সহজ ভাবে মেনে নেয় যে-কোন সাজেশন। কেন নেয়, কেউ জানে না।

গভীর স্তর আর হাল্কা স্তরে আকাশ পাতাল প্রভেদ, কিন্তু উভয় স্তরেই চেতন মনটা তলিয়ে যায় নিচে, অবচেতন মনটা উঠে আসে উপরে। এই সময় মানুষের প্রচণ্ড শক্তিশালী অবচেতন মনের সাথে যোগাযোগ করা সহজ হয়।

কি কি কাজে লাগে

সম্মোহনের সাহায্যে ব্যথা দূর করা যায়। দাঁতের ব্যথায় কষ্ট পাচ্ছেন, অসহ্য ঠেকছে সবকিছু—এই সময় সম্মোহনের সাহায্যে ব্যথাটা দূর করতে পারলে দারুণ হয় না ? এটা সম্মোহনের দ্বারা সম্ভব। মাঝারী স্তরে পৌঁছতে পারলেই যে-কেউ এই ভাবে যে-কোন শারীরিক অসহ্য যন্ত্রণার হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতে পারেন। অন্ততঃ ব্যথার তীব্রতা যে অনেকখানি হ্রাস করে নিতে পারেন তাতে কোন সন্দেহ নেই।

সম্মোহনের সাহায্যে অচৈতন্য বা শরীরের অংশ বিশেষকে অসাড় করে নিয়ে বড় বড় সার্জিকাল অপারেশন হচ্ছে আজকাল। কোন রকম ওষুধের সাহায্যে অজ্ঞান করবার প্রয়োজন পড়ছে না, সম্মোহনের সাহায্যে প্রয়োজনীয় অঙ্গ অসাড় করে নিয়ে হাত পা কেটে বাদ দিয়ে দেয়া হচ্ছে, বুক চিরে হৃৎপিণ্ডের উপর অস্ত্রোপচার হচ্ছে, একটা ফুসফুস কেটে বের করে আনা হচ্ছে—বিন্দুমাত্র ব্যথা পাচ্ছে না রোগী। সাধারণতঃ অপারেশনের সময় অ্যানাসথেটিক ওষুধ দেয়ারই নিয়ম—কিন্তু কারো কারো শরীরে বিশেষ কারণে অ্যানাসথেটিক ওষুধ সহ্য হয় না, তাদের জন্যে সম্মোহনের সাহায্যে অঙ্গ অসাড় করাটা অত্যন্ত উপকারী পদ্ধতি।

অ্যানাসথেটিক ওষুধ আবিষ্কারের আগে যে-কোন সার্জিকাল

অপারেশন রোগীর জন্যে ছিল ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্ন। জ্ঞান হারিয়ে ঢলে পড়বার আগে পর্যন্ত তীব্র যন্ত্রণা সহ্য করতে হয়েছে তাদের। এখন অবস্থা অনেক ভাল, কিন্তু পৃথিবীর সব জায়গায় সব ওষুধ পাওয়া যায় না—বিশেষ করে যুদ্ধাবস্থায় ত ওষুধ হয়ে ওঠে মহার্ঘ্য। সেই সময় হিপনটিক অ্যানাসথেশিয়া বিরাট এক ভূমিকা পালন করতে পারে।

আঠারশো চল্লিশ সালে জেমস এসডেইল নামে এক ব্রিটিশ সার্জেন ভারতে তিন হাজার রোগীকে অপারেশন করেছিলেন সম্মোহনের সাহায্যে অঙ্গ অসাড় করে নিয়ে। কিন্তু এর তেমন প্রসার হয়নি। কারণ এর কিছুদিনের মধ্যেই আবিষ্কার হয়ে গেল যে ক্লোরোফরম এবং ইথার দিয়ে মানুষকে অজ্ঞান করা যায়। এখন শুধু যেখানে ওষুধ চলে না সে সব ক্ষেত্রে ব্যবহার হচ্ছে সম্মোহনের। আর ব্যবহার হচ্ছে নারীর সন্তান প্রসবের কষ্ট দুর করবার কাজে।

কোরিয়ার যুদ্ধে এক সৈনিক আত্মসম্মোহনের সাহায্যে নিজের প্রাণ রক্ষা করেছিল। বোমায় দুটো হাতই উড়ে গিয়েছিল তার, রক্ত বন্ধ করতে না পারলে ট্রেঞ্চের ভিতরেই শুয়ে শুয়ে রক্তক্ষরণে মারা যেত সে। বাইরে থেকে সাহায্য আসতে অনেক দেরি হবে বুঝতে পেরে আত্মসম্মোহিত হয়ে শিরাগুলোকে সঙ্কুচিত হওয়ার আদেশ দিল সে, সেই সাথে সাজেশন দিল অসাড় হয়ে যাক তার হাত দুটো, দুর হয়ে যাক ব্যথা। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই কমে গেল রক্তক্ষরণ, তারপর বন্ধ হয়ে গেল। দুই ঘণ্টা পর উদ্ধার করা হয় তাকে। এখনো বেঁচে আছে সে লোক।

সম্মোহনের সাহায্যে মানুষের অতীতে ফিরে যাওয়া যায়। আমাদের জীবনে আজ পর্যন্ত যা কিছু ঘটেছে, আজ পর্যন্ত যা দেখেছি, শুনেছি বা অনুভব করেছি সব জমা আছে আমাদের স্মৃতিতে। সচেতন ভাবে স্মরণ করবার চেষ্টা করলে এতকিছুর অতি সামান্যই মনে আসে। কিন্তু সম্মোহিত অবস্থায় প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি শুধু স্মরণ করতে পারা নয়, সেই অতীতের ঘটনায় ফিরে যেতে পারে মানুষ—তখন যেমন লেগেছিল ঠিক সেই অনুভূতিগুলো আবার অনুভব করতে পারে। যদিও ঘটনাটা যখন ঘটেছিল তখনকার মত ততটা তীব্রতা থাকে না—একটা দ্বৈত মনোভাব রয়ে যায়—তবু আশ্চর্য স্পষ্ট ভাবে পুনরাবৃত্তি হয় অভিজ্ঞতার। এর জন্যে সম্মোহনের হাল্কা স্তরে পৌঁছতে পারলেই যথেষ্ট।

মনস্তাত্ত্বিক চিকিৎসায় সম্মোহনকে কাজে লাগিয়ে খুব অল্পসময়ে রোগীকে ভাল করে তোলা হচ্ছে আজকাল। শৈশবের ঠিক যে-সব ঘটনা রোগীর মানসিক ভারসাম্য নষ্ট করছে, আবার সে সবের মধ্যে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় তাকে। অতীতের ঘটনায় ফিরে যাচ্ছে সে ঠিকই, কিন্তু বর্তমানের পরিণত মনটাও যাচ্ছে সাথে। ফলে নতুন এক অন্তর্দৃষ্টি নিয়ে ফিরে আসছে বর্তমানে।

পুলিশের কাজেও এটা ব্যবহারের নজীর আছে। লস্ এঞ্জেল্সে একবার এক জুয়েলারীর দোকানে ডাকাতী হল। দুইজন দুষ্কৃতকারী পিস্তল দেখিয়ে ছিনিয়ে নিয়ে গেল বহু টাকার অলঙ্কার। ওরা যখন মাল নিয়ে গাড়িতে উঠছিল ঠিক সেই সময়ে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল একজোড়া নবদম্পতি। পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদের উত্তরে কেউই বলতে পারল না গাড়িটার নম্বর। এমন কি নাম্বার প্লেটের

দিকে ওরা চেয়েছিল কিনা সে কথাও স্মরণ করতে পারল না। তখন দুজনকে আলাদা ভাবে সম্মোহিত করে অতীতে নিয়ে গিয়ে দেখা গেল অবচেতন ভাবে দুজনেই দেখেছিল নাম্বার প্লেট—দু-জনের দেয়া নাম্বার এক ও অভিন্ন। দুষ্কৃতকারী দুজনকে খুঁজে বের করতে আর তেমন বেগ পেতে হয়নি পুলিশের।

আরেকটা দরকারী কাজে লাগে এই অতীতের ঘটনায় প্রত্যা-বর্তন। কোন দরকারী জিনিস, চাবি বা চিঠি হারিয়ে ফেলেছেন—কিম্বা কোথায় যে রেখেছেন কিছুতেই মনে করতে পারছেন না। অতীতে ফিরে গেলেই বেরিয়ে পড়বে জিনিসটা। আপনার অব-চেতন মন ঠিকই জানে কোথায় হারিয়েছেন ওটা। ওর চোখে ধুলো দেয়ার উপায় নেই, সব সময় সতর্ক রয়েছে মনের এই অংশটা—আপনি যখন ঘুমিয়ে আছেন, কিংবা কোন কারণে জ্ঞান হারিয়ে-ছেন, তখনো। এজ রিগ্রেশন বা এই অতীতে প্রত্যাবর্তনের মাধ্যমে অজ্ঞান অবস্থায় সার্জিকাল অপারেশনের সময় কি কি ঘটে-ছিল, কে কি বলেছিল সব স্মরণ করতে পারে মানুষ। সার্জেন যাঁরা এটা জানেন তাঁরা এই অজ্ঞান অবস্থাতেও রোগী সম্পর্কে বেফাঁস কোন কথা বলেন না, বরং এমন সব কথা বলেন যা রোগীর দ্রুত নিরাময়ের সহায়ক হয়। বড় কোন অপারেশনের পর রোগীর মধ্যে যে শক-রিঅ্যাকশন হয়, প্রস্রাব চেপে রাখার প্রবণতা দেখা দেয়, সে সব অনেকাংশে কমিয়ে দেয়া যায় অজ্ঞান অবস্থায় তার অব-চেতন মনের মধ্যে উপযুক্ত মনোভাব ঢুকিয়ে দিয়ে।

মেসমারের সময়েই সম্মোহনের সাহায্যে যা যা সম্ভব তার বেশির ভাগই আবিষ্কৃত হয়েছিল। ১৮২৩ সালে সম্মোহনের

সাহায্যে মাড়ি অসাড় করে নিয়ে দাঁত তোলার কথা জানা যায়। তার পর পরই সম্মোহিত অবস্থায় বেদনাহীন সন্তান প্রসব করেন এক মহিলা। হঠাৎ বছর বিশেক আগে আর একটি ব্যাপার আবিষ্কার করেছেন ডঃ লিন কুপার। উনি একে নাম দিয়েছেন টাইম ডিসটরশন।

আমরা সবাই জানি, খুব অল্প সময়ের মধ্যে লম্বা-চওড়া এক স্বপ্ন দেখে ওঠা সম্ভব। জানি, পানিতে ডুবন্ত মানুষ অনেক সময়, জীবনের বহু ঘটনার ছবি দেখতে পায় কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে।

চিন্তার এই অস্বাভাবিক দ্রুততা আনা যায় সম্মোহনের সাহায্যে। এজন্যে অবশ্য গভীর স্তরে যাওয়ার প্রয়োজন আছে। তিন ঘণ্টার পিয়ানো, অর্গ্যান বা টাইপ রাইটার অভ্যাস এইভাবে তিন সেকেণ্ডে সেরে নেয়া সম্ভব। আসল প্র্যাকটিসের সমান না হলেও অনেকটা কাজ হয় এই মানসিক প্র্যাকটিসে।

সাজেশন দিয়ে সম্মোহিত ব্যক্তির সমস্ত শরীর শক্ত, আড়ষ্ট করে দেয়া যায়। স্টেজে যাঁরা সম্মোহনের শো দেখান তাঁরা প্রায়ই করে থাকেন এটা। শক্ত হয়ে যাওয়া শরীরটা তুলে নিয়ে মাথাটা এক চেয়ারে রেখে পা রাখা হয় আরেক চেয়ারে, সটান সোজা হয়ে শুয়ে থাকে সম্মোহিত ব্যক্তি একটুও না বেঁকে। অবশ্য, এই ধরনের খেলা দেখান বিপজ্জনক।

সম্মোহনের সাহায্যে মানুষের দৃষ্টি বা শ্রুতি ভ্রম ঘটান সম্ভব। কিন্তু এটাও বিপদজনক হতে পারে মনে করে আমরা আলোচনা থেকে বিরত থাকছি। আত্মসম্মোহিত হয়ে ওসব চেষ্টা করা ঠিক নয়।

সম্মোহিতের লক্ষণ

সম্মোহনের খুব হালকা স্তরে আমরা সবাই যাই দিনে কয়েকবার করে, কিন্তু টের পাই না। কাজে মগ্ন অবস্থায়, বিশেষ করে ভয়, রাগ বা অনুরূপ জোরাল ভাবাবেগের সময় আমরা নিজের অজান্তেই সম্মোহিত হয়ে পড়ি।

নিয়ম অনুসরণ করে আপনি যখন সম্মোহিত হবেন তখন লক্ষ্য করবেন চোখের পাতা দুটো কাঁপছে অল্প অল্প। এটা হাল্কা সম্মোহনের লক্ষণ। কারো কারো বেশি ঢোক গিলবারও প্রবণতা দেখা যায়। আর একটু গভীরে গেলেই এই কাঁপন বা ঢোক বন্ধ হয়ে যায়। সম্মোহিত অবস্থায় নড়াচড়া করা যায়, কিন্তু একটা আলস্য আসে বলে নড়তে চায় না কেউ। সচেতন, জাগ্রত অবস্থায় আমরা খানিক পর পরই শুয়ে থাকলে পাশ ফিরছি, কিম্বা বসে থাকলে কাৎ হচ্ছি, কিন্তু সম্মোহিত অবস্থায় যেমন আছি তেমনিই থাকব বহুক্ষণ পর্যন্ত। এমন কি নাকের উপর মাছি বসলেও তাড়াতে ইচ্ছে হবে না।

সম্মোহিত অবস্থায় শরীরের পেশীগুলো শিথিল হয়ে যায়, ভাবলেশহীন হয়ে যায় মুখের চেহারা। শ্বাস-প্রশ্বাস অপেক্ষাকৃত গভীর হবে। পালস্ বিট কমে যাবে খানিকটা। মাঝারী স্তরে পৌঁছলে দেখা যায় চোখের পাতা বন্ধ অবস্থাতেও চোখ দুটো

নড়াচড়া করছে। সামান্য ফাঁকও হয়ে যেতে পারে চোখের পাতা।

এ ছাড়া আর সব লক্ষণ অনেকটা ঘুমেরই মত। সম্মোহন থেকে জেগে উঠে ঘুম থেকে ওঠার মতই সাধারণতঃ চোখ ঘষে মানুষ।

গভীরতা

আর কারো দ্বারা সম্মোহিত হলে সে আপনার শারীরিক পরিবর্তন লক্ষ্য করে টের পাবে ঠিক কতটা গভীর স্তরে পৌছেচেন আপনি। তার পক্ষে এটা খুব সহজ। ভাবলক্ষণ দেখে তেমন কিছু আঁচ করতে না পারলে ছোটখাট কয়েকটা পরীক্ষার মাধ্যমে সহজেই বুঝে নেয়া যায় গভীরতা। আপনার কোন অঙ্গ অসাড় করে নিয়ে পরীক্ষা করে দেখতে পারে, যে-কোন একটা হাতকে বেলুনের মত হালকা করে উপরে ভাসিয়ে তুলতে পারে, কিম্বা একটা হাত আড়ষ্ট করে দিয়ে দেখতে পারে নড়াতে পারে কিনা।

কিন্তু আত্মসম্মোহনের সময় বাইরে থেকে সাহায্য পাচ্ছেন না আপনি, সম্মোহনের গভীরতা বুঝতে হলে নির্ভর করতে হবে আপনার নিজেরই অবচেতন মনের দেয়া তথ্যের উপর।

মনে মনে একটা একগজ লম্বা কাঠি বা ফিতে কল্পনা করুন—এক ইঞ্চি পর পর একটা করে কালো দাগ কাটা আছে তাতে। বারো এবং চব্বিশ ইঞ্চির জায়গায় গভীর লাল দাগ। ভেবে নিন প্রথম এক ফুট হাল্কা স্তর, দ্বিতীয় ফুট মাঝারী স্তর এবং তৃতীয় ফুট হচ্ছে

গভীর স্তর।

সম্মোহিত অবস্থায় এই গজ কাঠিটি কল্পনা করুন চোখের সামনে—হাল্কা দিকটা উপরে। কল্পনার চোখে একটা তীর বা ইণ্ডিকেটর তৈরি করে নিন। প্রথম ইঞ্চিতে সেট করা আছে সেটা। এবার নিজেকে সাজেশন দিন তীরটা প্রথম ইঞ্চি ছেড়ে নিচে নামতে শুরু করবে, আপনি সম্মোহনের যে স্তরে রয়েছেন ঠিক সেখানে এসে থামবে কাঁটা। কল্পনায় স্পষ্ট দেখতে পাবেন নেমে আসছে ইণ্ডিকেটরের কাঁটা, কোন এক জায়গায় এসে থেমে দাঁড়াবে ওটা। কত ইঞ্চিতে দাঁড়াল দেখে নিলেই আপনি বুঝতে পারবেন ঠিক কতটা গভীরতায় পৌছেচেন। পরীক্ষা করে দেখা গেছে এই মাপটা প্রায় সব ক্ষেত্রেই সঠিক গভীরতা নির্দেশ করে। ভুলের মাত্রা খুবই কম।

কি উপকারে আসে ?

সম্মোহনের সাহায্যে অবচেতন মনকে দিয়ে শরীরের উপর নানান ধরনের প্রভাব বিস্তার করান যায়। কেন এটা হয় তা নিয়ে গবেষকরা গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন, কিন্তু সাধারণ ভাবে আমরা ধরে নিতে পারি আমাদের ভিতরের মনটা শরীরের অভ্যন্তরীণ কলকজাকে অনেকখানি নিয়ন্ত্রণ করবার ক্ষমতা রাখে।

দ্রুত নিরাময় এবং রক্ত সঞ্চালন নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে আগেই বলেছি। সাজেশন দিয়ে হার্ট বিট এবং শরীরের উত্তাপ বাড়ান-কমান যায় অনায়াসে। সম্মোহিতকে যদি বলা যায়, ঘরটা অসম্ভব ঠাণ্ডা, তাহলে শীতে গায়ে কাঁটা দেবে তার, ঠক ঠক করে কাঁপবে। তেমনি অতিরিক্ত গরমের সাজেশন দিয়ে গায়ে ঘামাচি উঠিয়ে দেয়া সম্ভব। শরীরের উপর অবচেতন মনের ঠিক কতখানি নিয়ন্ত্রণ তা পুরোপুরি জানা যায়নি এখনো, তবে হজম ক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রিত করা সম্ভব হয়েছে, কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করা গেছে অতি সহজে। ঋতু-স্রাবের গোলমাল সারিয়ে তোলারও খবর পাওয়া গেছে। সম্মো-হন সম্পর্কে আরো যত জ্ঞানের প্রসার হবে ততই জানা যাবে কি কি কাজে একে ব্যবহার করে মানুষ উপকৃত হতে পারে। বর্তমানে শারীরিক নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে যেটুকু জানা গেছে তার থেকে উপকৃত হচ্ছে বহু রোগী।

মনোবৈজ্ঞানিক চিকিৎসায় সম্মোহনকে ব্যবহার করে আশ্চর্য সব ফল পাওয়া গেছে। এই বিশেষ ক্ষেত্রে আত্মসম্মোহনের সাহায্যে প্রভূত উপকার পেয়েছে অসংখ্য লোক। চারিত্রিক দুর্ব-লতা, বদভ্যাস এবং হালকা স্নায়বিক বৈকল্য সারিয়ে তোলা সম্ভব হচ্ছে উপযুক্ত নিয়মে আত্মসম্মোহনের সাহায্যে। নিদ্রাহীনতা, মোটা হয়ে যাওয়া, তোতলামি ইত্যাদির জন্যে সম্মোহনের বাড়া আর কোন ওষুধ নেই।

শিক্ষার ব্যাপারেও অনেক সাহায্য পাওয়া যেতে পারে সম্মো-হনের। অনেকের অভিযোগ, মন বসাতে পারে না—আমার ভাই কনসেনট্রেশন নেই, স্মরণশক্তি কম। আত্মসম্মোহনের সাহায্যে

ধূমপান ত্যাগে

অনায়াসে যে-কোন কাজে মন বসাতে পারবেন এঁরা। ছাত্র-ছাত্রীরা বিশেষ ভাবে উপকৃত হবে এ থেকে। সম্মোহিত অবস্থায় চোখ খোলা রাখা এমন কিছুই কঠিন নয়। এইভাবে আশেপাশের প্রতিকূল পরিবেশ উপেক্ষা করে চঞ্চল বা বিক্ষিপ্ত মন যে-কোন কাজে বসান সম্ভব। এর ফলে কাজটাও অনেক ভাল ভাবে সম্পন্ন করা যায়।

এমন কি সম্মোহিত অবস্থায় পরীক্ষা দেয়াও সম্ভব। এই অবস্থায় উত্তরগুলো একের পর এক ভেসে উঠবে মনের পর্দায়। আত্মসম্মোহন জানা থাকলে নিজেকে দিয়ে বহু কিছুই করিয়ে নেয়া যায়।

ক্লান্তি আর একটা ব্যাপার। ক্লান্ত হয়ে পড়লে আমাদের শরীরের টিস্যুগুলোর রাসায়নিক পরিবর্তন হয়। এই পরিবর্তন বন্ধ করে দিতে পারে অবচেতন মন। ক্লান্ত হয়ে পড়লে খুব অল্প সময়ে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে পারে। পাঁচ মিনিটে দূর হয়ে যাবে ক্লান্তি বোধ। অতিরিক্ত ক্লান্ত হয়ে পড়লে আত্মসম্মোহনের সাহায্যে খুব অল্প সময়েই আবার সজীব, প্রাণবন্ত হয়ে উঠতে পারেন আপনি ইচ্ছে করলেই।

তবে এটা সব সময়েই খেয়াল রাখা দরকার—সম্মোহন কোন জাতুমন্ত্র নয়, এর কাছ থেকে অলৌকিক কিছু আশা করা ভুল। এটা অবচেতন মনের কাছে পৌছবার একটা সহজ উপায় মাত্র। সবাই সবকিছু পারবেন, তা নয়। সব সময় সাজেশনে কাজ হবেই তারও কোন নিশ্চয়তা নেই, যে ফল আশা করা যায় সেটা হয়ত পাওয়া যায় না। এটা ধরা ছোঁয়ার বাইরের একটা ব্যাপার, এ

সম্পর্কে সবকিছু জানা যায়নি আজো। কাজেই এটা নিয়ে যা খুশি তাই পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা ঠিক না। যা-তা সাজেশন দেয়াও ঠিক না। এর ফলে হয়তো ক্ষতিও হতে পারে।

কিভাবে সাজেশন দিলে অবচেতন মন সহজে গ্রহণ করে সেটা নিয়ে আলোচনায় নামব আমরা আগামী পরিচ্ছেদে। সেই সাথে আলাপ করা যাবে কেমন ধরনের সাজেশন দিলে ক্ষতির সম্ভাবনা নেই।

অটোসাজেশন

ধান ভানতে শিবের গীত গাইছি কি ?

না। ধূমপান ত্যাগের প্রসঙ্গে আসব আমরা খানিক বাদেই। কিন্তু প্রসঙ্গতঃ এমন একটি বিদ্যা নিয়ে আমরা আলোচনায় নেমেছি, যেটা যতটা সংক্ষেপ করেছি তার চেয়ে অল্প কথায় সেরে দেয়া উচিত হতো না। আত্মসম্মোহন শেখা হয়ে যাচ্ছে আপনার, ধূমপান ছাড়াও আরো কি কি কাজে লাগাতে পারেন সে সম্পর্কেও আভাস দিয়েছি, কাজেই এটা যাতে ঠিকমত ব্যবহার করতে পারেন সেদিকটাও আমার দেখতে হবে। ভুল সাজেশন দিয়ে যেন নিষ্ফল কালক্ষেপ না করেন সেটা দেখাও আমার কর্তব্য।

ইংরেজি সাজেশন শব্দটার ঠিক উপযুক্ত প্রতিশব্দ পেলাম না বলে এটাকেই রেখে দিচ্ছি। 'উপদেশ' শব্দটি ত এ প্রসঙ্গে একেবারেই খাপছাড়া। 'পরামর্শ'ও ঠিক না। ইঙ্গিত, সঙ্কেত, প্রস্তাব—শব্দগুলো অনেকটা কাছাকাছি যায়, কিন্তু এগুলোকে সাজেশনের ঠিক প্রতিশব্দ বলা যায় না। কাজেই থাকুক ওটাই।

আমরা জানি সাজেশনের সাহায্যে অবচেতন মনকে প্রভাবিত করা যায়। এ-ও জানি অবচেতন মনটা বিশ্লেষণ করে না কোন কিছুই—যেটা যেমন ভাবে তার সামনে হাজির করা হয় সেটাকে ঠিক তেমনি ভাবেই গ্রহণ করে।

আমরা সবাই কম-বেশি প্রভাবিত হই সাজেশনের দ্বারা। এই সাজেশন জিনিসটাই ব্যবহার করবেন আপনি ধূমপান ত্যাগের ব্যাপারে। তাই কিভাবে ব্যবহার করলে সবচেয়ে বেশি ফল পাওয়া যায় বুঝে নেয়া দরকার আপনার।

অটো-সাজেশনের চেয়ে হিটারো-সাজেশনের শক্তি অনেক বেশি। আপনি নিজেকে নিজে যা বলবেন অবচেতন মন সেটাকে যত তাড়াতাড়ি গ্রহণ করবে, তার চেয়ে অনেক তাড়াতাড়ি গ্রহণ করবে যদি সেই একই কথা আর কেউ বলে। যাই হোক, আত্ম-সম্মোহিত হয়ে আর কাউকে যখন সব সময়ে পাচ্ছেন না, তখন নিজে নিজে এর থেকে যতটা ফায়দা ওঠান যায় ততই লাভ।

সাজেশন জিনিসটা আদেশের মত করেও বলা যায়, আবার সাদামাঠা বক্তব্য পেশের মত করেও বলা যায়। সরাসরি বলা যায়, ঘুরিয়েও বলা যায়। হাঁ-সূচক ভাবে বলা যায়, না-সূচক ভাবেও বলা যায়। কিন্তু অটো-সাজেশন সাধারণতঃ ঘোরপ্যাঁচের মধ্যে না গিয়ে সহজ ভাষায় সরাসরি বলা হয় হাঁ-সূচক বাক্যের সাহায্যে —কখনো আদেশের মত, কখনো সাদামাঠা বক্তব্যের মত। না-সূচক বাক্য পারতপক্ষে ব্যবহার করা উচিত নয়। 'আমার মধ্যে সিগারেট খাওয়ার ইচ্ছে থাকবে না।'—বাক্যটি না-সূচক। এটাকেই ঘুরিয়ে হাঁ-সূচক করা যায়ঃ 'সিগারেট খাওয়ার ইচ্ছে থেকে মুক্ত

হব।'

জোরের সাথে আদেশ করলে অবচেতন মন সেটা সহজে গ্রহণ করতে চায় না। তার চেয়ে তার সামনে সাদামাঠা ভাবে বক্তব্য রাখলে সাধারণত ফল হয় বেশি। আদেশ কেউই পছন্দ করে না, আপনার অবচেতন মনও না। কাজেই আদেশ না করে তার কাছ থেকে ভজিয়ে ভাজিয়ে মাথায় হাত বুলিয়ে কাজ আদায় করে নেয়াই ভালো। কিন্তু কারো কারো ক্ষেত্রে আবার আদেশেই কাজ হয় বেশি। এটা নির্ভর করে যার যার বিশেষ ব্যক্তিগত মানসিকতার উপর। অনেকের মধ্যে হুকুম তামিল করবার একটা প্রবণতা থাকে। তাদের জন্যে আদেশেই কাজ হয় বেশি।

'তুমি সিগারেট ছেড়ে দেবে,' কথাটা সাদামাঠা বক্তব্য, কিন্তু বলার ভঙ্গিতে এটা আদেশ হয়ে উঠতে পারে। আবার, 'সিগারেট তোমাকে ছাড়তেই হবে,' কথাটা বলার ভঙ্গিতে দুর্বল, অনুরোধের মতও হয়ে যেতে পারে। কি ধরনের সাজেশন আপনার জন্যে ভাল সেটা আপনাকেই বুঝে নিতে হবে নানান ধরনের সাজেশন দিয়ে ফলাফল দেখে।

যে-কোন সাজেশন মনের মধ্যে বসাবার সবচেয়ে ভাল উপায় হচ্ছে পুনরাবৃত্তি। বিশ-ত্রিশ বা চল্লিশবার বা তারও বেশিবার পুনরাবৃত্তি করা দরকার প্রত্যেকটা সাজেশন। বিজ্ঞাপনে এই পুনরাবৃত্তিকে ব্যবহার করা হয় খুব বেশি। আপনাকে যদি প্রশ্ন করি : সবচেয়ে ভাল আলকাতরা কোন্‌টা ? আপনি বলবেন :···মার্কা আলকাতরা। কেন ঐ নামটা মনে এল আপনার ? রেডিও-টিভি আর খবরের কাগজের মাধ্যমে এত বেশিবার আপনার সামনে তুলে

ধরা হয়েছে নামটা, এতবার পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে যে বসে গেছে ওটা আপনার মনের মধ্যে। হয়ত জীবনে চোখেও দেখেননি ঐ আলকাতরা, জানা নেই ওটার রঙ কাল না লাল—অথচ ঐ নামটাই বেরিয়ে আসছে মুখ দিয়ে।

এসব বিজ্ঞাপনের সুপরিচিত কৌশল। কোন কারণে যদি আপনার আজ আলকাতরার প্রয়োজন হয়, বাজারে গিয়ে সোজা ঐ নামটা উচ্চারণ করবেন আপনি, খুশি মনে ওটা কিনে নিয়ে আসবেন—ভাল বা মন্দ দেখবেন না; ওর চেয়ে আরো ভাল কোন আলকাতরা আছে কিনা সে খোঁজও হয়ত করবেন না। আপনার অবচেতন মনের মধ্যে ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে নামটা। তেমনি ব্যাটারী, সাবান, বিস্কিট, বা এই রকম আরো জিনিসের নাম ভাবার চেষ্টা করে দেখুন—দেখবেন কেমন চট্ করে এক-একটা নাম লাফিয়ে ওঠে মনের মধ্যে। প্রস্তুতকারকেরা খামোকা বিজ্ঞাপন দেন না। সাজেশন এবং সম্মোহনের নিয়ম-কানুন-পদ্ধতি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান থাকলে এঁরা আরো অনেক জোরাল ভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারতেন নিজেদের।

পুনরাবৃত্তি হল, কিন্তু সেই সাথে আপনার বক্তব্য অনুযায়ী কাজ করবার জন্যে যথেষ্ট সময় দেয়া দরকার অবচেতন মনকে। বাক্যটা এমন ভাবে গঠন করতে হবে যেন ঠিক এই মুহূর্তে কিছু করতে বলছেন না আপনি—আগামী কিছুক্ষণ বা কয়েকদিনের মধ্যে করতে বলছেন। সিগারেট ছেড়ে দিয়েছেন, কিন্তু খাওয়ার প্রবল ইচ্ছে, সেই অবস্থায় যদি আপনি সাজেশন দেন ঃ আমার সিগারেট খেতে ইচ্ছে হচ্ছে না—তাহলে মারাত্মক ভুল হবে। প্রথম কথা, এটা

নির্জলা মিথ্যা। মিছে কথা সহ্য করবে না আপনার অবচেতন মন। দ্বিতীয়, এটা না-সূচক বাক্য। তৃতীয়তঃ, কোন সময় দিচ্ছেন না আপনি অবচেতন মনকে। যদি বলেন: কিছুক্ষণের মধ্যেই সিগারেট খাওয়ার ইচ্ছেটা দূর হয়ে যাবে, ভুলে যাব ওর কথা—তাহলে বক্তব্যটা হাঁ-সূচক হচ্ছে, আর কথাটা গ্রহণ করে সেই অনুযায়ী কাজ করবার সময়ও পাচ্ছে আপনার অবচেতন মন।

অটো-সাজেশন দেয়ার সময় কথাগুলো জোরে উচ্চারণ না করে মনে মনে চিন্তা করলেও চলে। তবে অনেকে আবার মুখে উচ্চারণ করলে উপকার পান বেশি। আপনার জন্যে যেটা সুবিধে হয় তাই করবেন—ধরা-বাঁধা নিয়ম নেই।

কোন সাজেশনের পিছনে যদি অনুপ্রেরণা বা অন্তরের তাগিদ থাকে তাহলে চট্ করে মেনে নেয় সেটা অবচেতন মন। সিগারেট ছেড়ে দেয়ার ইচ্ছেটা আপনার যত জোরাল হবে ততই সহজ হবে ছেড়ে দেয়া। নিজের মধ্যে কোন একটা ভাবাবেগ সৃষ্টি করে সেটা যদি আপনার সাজেশনের সাথে যুক্ত করতে পারেন তাহলে দারুণ ফল পাবেন। কোন কথা বা কাল্পনিক ছবি বা এই দুয়ের সংমিশ্রণে ভাবাবেগ তৈরি করে নিতে পারেন। সিগারেট ছাড়তে পারলে কেমন বিজয়ীর মনোভাব আসছে আপনার মধ্যে সেটা কল্পনা করতে পারেন, কিম্বা বিফল হলে বন্ধু-বান্ধবের সামনে কেমন লজ্জায় পড়ছেন তার কাল্পনিক ছবি দেখতে পারেন।

যে-কোন সাজেশন কার্যকরী করবার ব্যাপারে কাল্পনিক ছবির একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। সাজেশনের কথাগুলোর সাথে যদি কল্পনা যুক্ত হয় তাহলে দুয়ে মিলে গভীর ছাপ ফেলতে পারে

অবচেতন মনের উপর। বার বার কোন ছবি মানসচক্ষে দেখলে অবচেতন মন সেটাকে বাস্তবে রূপ দিতে চেষ্টা করে থাকে। কেন হয় জানা নেই, কিন্তু এটা হয়। মানসচক্ষে চাহিদার ছবিটা যে যত স্পষ্ট দেখতে পাবে, তার চাহিদাটা ঠিক ততই দ্রুত পূরণ হবে। এটাই নিয়ম।

সিগারেট ছেড়ে দেয়ার ব্যাপারে এই জ্ঞানটা কাজে লাগাতে পারেন আপনি চমৎকার ভাবে। কল্পনার চোখে নিজেকে দেখুন কয়েকজন ধূমপায়ীর সাথে একটা ঘরে বসে আছেন। সবাই সিগারেট ফুঁকছে, আপনি ছাড়া। ধোঁয়ায় ভরে গেছে ঘরটা, বিচ্ছিরি লাগছে আপনার, কাশি আসছে, রাগ লাগছে লোকগুলোর উপর। একটা কিছু ছুতো খুঁজে নিয়ে বেরিয়ে গেলেন আপনি ঐ ঘর থেকে।

একবার অনেক বেশি সাজেশন দিয়ে আপনার অবচেতন মনকে ভারাক্রান্ত করবেন না। যে-কোন একটা ব্যাপারে সাজেশন দেয়া ভাল। বড় জোর দুটো। সিগারেট ছাড়তে চান, আত্মবিশ্বাসী হতে চান, সুখী হতে চান, ওজন কমাতে চান, যৌনজীবনে ভারসাম্য চান—সব যদি এক সাথে এক বৈঠকে চান তাহলে সব গুলিয়ে যাবে—কাঙ্ক্ষিত ফল পাওয়া যাবে না। অন্ততঃ এক সপ্তাহ একটা সাজেশন নিয়ে থাকা ভাল, তারপর সেটা ছেড়ে আর একটা।

আরো একটা কথা। ফলাফল আপনি যা চান সেই অনুযায়ী সাজেশনের বাক্য তৈরি করুন। ঠিক কি চান সে ব্যাপারে নিজে আগে পরিষ্কার বুঝে নিন। আপনার চেতন মনের চেয়ে অনেক

ভাল ভাবে জানা আছে অবচেতন মনের কি করে সেই লক্ষ্যে পৌঁছতে হবে। একে যদি একবার রওনা করে দিতে পারেন, আর কোন চিন্তা নেই, ঠিক পৌঁছে যাবে লক্ষ্যে। ধূমপান প্রসঙ্গে আপনি যদি বলেন : শীঘ্রিই সিগারেট খাওয়ার ইচ্ছের কবল থেকে মুক্তি পাব—ব্যাস, আর কিছুর দরকার পড়ছে না। ইচ্ছে না হলে খাচ্ছেন না আপনি আর সিগারেট। কেমন ভাবে কোন্ কৌশলে আপনার ইচ্ছেটা দূর করবে, সেটা বের করে নিক আপনার অবচেতন মন। বুঝতে পারলেন ?

যত যাই সাজেশন দিন, সেটা অবচেতন মনকে দিয়ে গ্রহণ করানটাই আসল কাজ—তা নইলে সব ফক্কা। কাজেই এ ব্যাপারে আপনার সতর্ক থাকতে হবে। সাদামাঠা বক্তব্য যদি বারবার পুনরাবৃত্তি সত্ত্বেও কিছুতেই গ্রহণ না করে, আদেশ করে দেখুন কাজ হয় কিনা। মনে মনে বললে যদি দেখেন তেমন সুবিধে হচ্ছে না, জোরে বলুন। 'আমি' বলে যদি দেখেন তেমন নড়েচড়ে না, নিজেকে 'তুমি' বলে সম্বোধন করুন—যেন বাইরে থেকে আর কেউ আপনার অবচেতন মনকে বিশেষ কাজে উদ্বুদ্ধ করছে। সব রকম করে দেখুন কিসে সবচেয়ে বেশি সাড়া পাওয়া যায়।

ম্যাক্স ফ্রিডম লঙ নামের এক ভদ্রলোক নানান ধরনের সাজেশন নিয়ে রীতিমত গবেষণা চালিয়ে কয়েকটি সত্যে উপনীত হয়েছেন। ওঁর 'সেলফ-সাজেশন' বইয়ে সাজেশন দেয়ার সময় তিনি সবাইকে গভীর শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণের উপদেশ দিয়েছেন। তাঁর মতে এই সময় গভীর ভাবে শ্বাস-প্রশ্বাস নিলে এবং সাজেশনের উপর একবার তীব্র মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করে, একটু ঢিল দিয়ে আবার তীব্র

মনোযোগ দিলে (এবং এইভাবে বারকয়েক মনোযোগের মাত্রা কম-বেশি করলে) ভাল ফল পাওয়া যায়। তিনি আরো বলেন, অবচেতন মনকে দিয়ে যে সাজেশন গ্রহণ করাতে চান তার প্রতি আপনার যদি সচেতন বিশ্বাস ও নিষ্ঠা থাকে তাহলে সবচেয়ে ভাল ফল পাওয়া যায়।

ডক্টর জেমস এম. হিক্সন বলেন, অবচেতন মনকে দিয়ে যে বক্তব্যটা গ্রহণ করাতে চান সেটাকে আগে বিস্তারিত ভাবে লিখে ফেলুন। তারপর সেটার সংক্ষিপ্ত সারমর্ম লিখুন। তারপর আরো সংক্ষেপ করে একটা বা দুটো লাইনে নিয়ে আসুন সেটাকে। বাড়তি কথা সব ছেঁটে ফেলে—কেবল যেটা চান সেটা থাক। এই দুই লাইন থেকে একটা বা দুটো শব্দ বেছে বের করুন যেটা বললেই প্রথমে বিস্তারিত যা লিখেছিলেন তার ভাবধারাটা প্রকাশ পায়। এই শব্দটি বা শব্দ দুটো বারকয়েক বলতে হবে, তারপর চিন্তাটা বিষয়ান্তরে নিয়ে যেতে হবে। সম্পূর্ণ ভিন্ন ভাবনায়। আত্মসম্মোহিত অবস্থায় এইভাবে সাজেশন দিলে ডক্টর হিক্সনের মতে ভাল ফল পাওয়া যায়।

বিখ্যাত মনস্তত্ত্ববিদ প্রফেসর এম. ইউ আহমেদ বলেন, আপনি যা চাইছেন সেটাকে হাঁ-সূচক একটা সংক্ষিপ্ত বাক্যে ধরতে হবে। তিনিও বলেন কিভাবে কাজটা করতে হবে সেটা জানা আছে অবচেতন মনের, কাজেই আপনি যে ফলাফলটা চান বাগাড়ম্বরে না গিয়ে শুধু সেটারই উল্লেখ করুন সংক্ষেপে। এই একটি বাক্যে আপনি ঠিক কি কি বোঝাতে চাইছেন ভেবে নিন ভাল করে। ধরুন, আপনি বাক্য তৈরি করলেন ঃ আমি বড় হব।

এই কথাটা দিয়ে আপনি ঠিক কি বোঝাতে চান—শারীরিক, মানসিক, পারিবারিক বা সামাজিক কোন্ দিক থেকে কোন্ বিষয়ে কত বড় হতে চান সেসব ভাল করে বুঝে নিন একবার। তারপর সব চিন্তা মাথা থেকে দুর করে দিয়ে তোতাপাখির মত শুধু আউড়ে যান : আমি বড় হব, আমি বড় হব, আমি বড় হব···। যখন এই পুনরাবৃত্তি করছেন তখন এই বাক্যটি দিয়ে আপনি কি কি বোঝাতে চান সে সম্পর্কে বিন্দুমাত্র ভাবনা-চিন্তার প্রয়োজন নেই, অতিরিক্ত মনোযোগ দেয়ার প্রয়োজন নেই, ঘুমের আগে এবং ঘুম থেকে উঠে শরীর মন শিথিল করে দিয়ে মুখস্থ বুলির মত শুধু আউড়ে যান বিশ-ত্রিশ বা চল্লিশ বার। এতেই কাজ হবে।

ফ্রান্সের এমিলি কুয়ে অটো-সাজেশনের ব্যাপারে জাঁদরেল এক ব্যক্তিত্ব। তাঁর মতে প্রত্যেক সমস্যার জন্যে আলাদা আলাদা সাজেশন না দিয়ে একটা সাধারণ সর্বব্যাপী সাজেশন ব্যবহার করা ভাল। প্রত্যেকদিন বার বার করে বলতে বলছেন উনি : এভরি ডে ইন এভরি ওয়ে আই অ্যাম গেটিং বেটার অ্যাণ্ড বেটার। কথাটার বাংলা ভাবানুবাদ এ রকম হতে পারে : দিন দিন সবদিক থেকে ভাল হচ্ছি। এই একটি কথায় সবই এসে যাচ্ছে। কুয়ে বলছেন সাজেশন সব সময় হাঁ-সূচক হতে হবে। এমনকি 'চেষ্টা' শব্দটিকেও বাদ রাখার উপদেশ দিচ্ছেন তিনি। 'চেষ্টা'র মধ্যে সন্দেহ রয়েছে—বিফল হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। যখনই আপনি বলছেন কোন কাজ করবার চেষ্টা করবেন, বোঝা যাচ্ছে সফল হবেন কিনা সে ব্যাপারে আপনার মনে সন্দেহ রয়েছে। যাই করুন না কেন, হাঁ-সূচক মনোভাব নিয়ে কাজে নামা উচিত। সিগারেট আপনি ছাড়তে যাচ্ছেন—ছেড়ে দেয়ার চেষ্টা করতে নয়।

আত্মসম্মোহনের প্রস্তুতি

সম্মোহন সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা হয়ে গেছে আপনার। অনেক ভুল ধারণারও নিরসন হয়েছে। এবার এটাকে শিখে নিয়ে নিজের কাজে লাগাবার প্রস্তুতি পর্বে চলে এসেছি আমরা। সিগারেট ছেড়ে দেয়ার সময় দেখতে পাবেন কি আশ্চর্য ফল পাওয়া যায় এ থেকে। কষ্ট যতটা হবে ভাবছেন তার দশ ভাগের একভাগও হবে না। শুধু সিগারেট ছাড়ার কাজে কেন, এই বিদ্যা আপনি জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে প্রভূত উপকার পাবেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। সেইজন্যেই এতটা সময় ব্যয় করলাম আমরা এর পিছনে। সিগারেট ছেড়ে দেয়ার পর হয়ত দাঁত তোলার সময় ছাড়া আর কোন সময় এ বিদ্যা আপনার ব্যবহারের প্রয়োজন পড়বে না—তবু ইচ্ছে করলেই আপনি আপনার অবচেতন মনের উপর প্রভাব বিস্তার করবার ক্ষমতা রাখেন, এই জ্ঞানটা আপনার আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে দেবে অনেকখানি।

শতকরা পঁচানব্বই জন মানুষই যখন পারে, তখন খুব সম্ভব আপনি সহজেই শিখে নিতে পারবেন আত্মসম্মোহন। কয়েকদিন

অভ্যাস করলেই হয়ে যাবে। কারো কারো পক্ষে একটু কঠিন হবে, বেশি চেষ্টা করতে হবে। অল্প কয়েকজন চেষ্টা করেও সফল হতে পারবেন না। আপনি যদি দুর্ভাগ্যবশতঃ এই শেষের দলে পড়েন, তবু এই বইয়ে যে নিয়ম দেয়া হচ্ছে সেগুলো ব্যবহার করে সিগা-রেট ছেড়ে দেয়া আপনার পক্ষে সম্ভব হবে—কষ্টও অপেক্ষাকৃত কম হবে।

আত্মসম্মোহন শেখার সবচেয়ে সহজ নিয়ম হচ্ছে প্রথমে আর কারো দ্বারা সম্মোহিত হওয়া। সাধারণতঃ এইভাবে এক বৈঠকেই শিখে নেয়া যায় আত্মসম্মোহন, কারো কারো বেলায় দুই বা তিন বৈঠকের প্রয়োজন পড়ে—তার বেশি নয়।

আপনাকে সম্মোহিত করে পোস্ট-হিপনটিক সাজেশন দিয়ে দেবেন সম্মোহনকারী। সংক্ষিপ্ত একটা নিয়ম বাতলে দেবেন। কি করে সম্মোহিত হতে হবে এবং গভীরতর স্তরে পৌছতে হবে সে ব্যাপারে দু একটা কথা বলে দেবেন, হয়ত দু'একটা শব্দ গেঁথে দেবেন আপনার মনের মধ্যে—ব্যাস, শেখা হয়ে গেল। যখনই সম্মোহিত হওয়ার দরকার, প্রাথমিক নিয়মগুলো পালন করবার পর (যেমন ঢিলে জামা-কাপড় পরে নরম বিছানায় শোয়া, বা ইজি চেয়ারে আরাম করে বসা, ইত্যাদি) আপনি শুধু বারকয়েক সেই বিশেষ শব্দ উচ্চারণ করলেই আত্মসম্মোহিত হয়ে পড়বেন। কয়েক দিন নিজে নিজে প্র্যাকটিস করলেই গভীর স্তরে পৌছে যেতে পারবেন।

ধূমপান ত্যাগের ব্যাপারে আপনি হালকা স্তরে পৌছতে পারলেই যথেষ্ট, কাজেই যদি কোন হিপনটিস্টকে পান, খুবই ভাল কথা। এক

বৈঠকেই হয়ে গেল, নইলে টেপ রেকর্ডার বা কোন বন্ধু-বান্ধবের সাহায্য নিয়ে এটা শিখে নিতে মোটেই কষ্ট হবে না আপনার।

নিজে নিজে একা যদি শিখতে চান তাহলে একটা টেপ রেকর্ডার লাগবে আপনার। আগামী পরিচ্ছেদে আত্মসম্মোহিত হওয়ার জন্যে যে সাজেশন রয়েছে সেটা রেকর্ড করে নিতে হবে। টেপ রেকর্ডারের বদলে কোন আত্মীয় বা বন্ধুকে দিয়ে ওটা পড়ালেও কাজ হবে। আপনি বন্ধুকে দিয়ে ওটা পড়ান, বা নিজেই রেকর্ড করে নিয়ে শোনেন, বা কোন হিপনটিস্টের সাহায্য গ্রহণ করেন —আসলে নিজেকে নিজেই সম্মোহিত করছেন আপনি। সব সম্মোহনই আত্মসম্মোহন। যখন শুনছেন, যা বলা হচ্ছে সেটা অনুসরণ করুন। যখন কোন যন্ত্র বা মানুষের সাহায্যের প্রয়োজন থাকবে না, তখন যে নিয়ম বলা হয়েছে ঠিক ঠিক সেটা অনুসরণ করুন—তাহলেই চলবে।

অনুশীলনের নিয়ম

আরাম করে বসে বা শুয়ে যে-কোন একটা কিছুর উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে হবে। যে-কোন জিনিস হলেই চলবে, ছাতের একটা দাগ বা দেয়ালের পেরেক—যা খুশি। স্বাভাবিক ভাবে চাইলে দৃষ্টিটা যেখানে পড়ে তার চেয়ে একটু উপরে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলে ভাল। জামা-কাপড় আঁটো না হয়ে ঢিলে-ঢালা হওয়া বাঞ্ছনীয়। নিরি-

ঝিলি, শান্ত, ঠাণ্ডা পরিবেশ হলে ভাল।

সম্মোহনের আসল ব্যাপার হচ্ছে মনটা স্থির করে শরীরটা শিথিল করে নিজেকে ছেড়ে দেয়া। আচ্ছন্ন ভাবটা আপনিই আসবে, চেষ্টা বা জোর খাটাতে নেই। চেষ্টা করতে গেলে সম্মোহিত হওয়া কঠিন হয়ে পড়ে। আপনাকে যে সাজেশন দেয়া হচ্ছে সেই মত কাজ করুন, বিশ্লেষণ করতে যাবেন না। যা বলা হচ্ছে তার মধ্যে ডুবে যান, মন দিয়ে শুনুন প্রতিটি কথা অন্যান্য সব চিন্তা-ভাবনা দুরে ঠেলে দিয়ে। যতই শরীর-মন ঢিল দিয়ে বক্তব্যে মনোনিবেশ করবেন ততই গভীর স্তরে চলে যাবেন। নিজে নিজে, রেকর্ড বা বন্ধুর সাহায্য ছাড়া আত্মসম্মোহিত হওয়ার আগে অন্ততঃ তিনবার এই নিয়মে সম্মোহিত হওয়া দরকার।

প্রথম দিকে বুঝে ওঠা মুশকিল সম্মোহিত হয়েছেন কিনা। গভীর স্তরে পৌঁছলে নিজেই টের পাওয়া যায়, কিন্তু হালকা স্তরে ঠিক বুঝে ওঠা শক্ত। কিন্তু সন্দেহকে ভিড়তে দেবেন না কাছে। প্রথম কয়েকবার সন্দেহ, সমালোচনা ত দূরে থাক ফল হচ্ছে কি হচ্ছে না সেসব নিয়েও উদ্বিগ্ন হওয়ার দরকার নেই। ধরে নিন আপনি সম্মোহিত হচ্ছেন। বিশ্লেষণের প্রয়োজন নেই—শরীর-মন ঢিল দিয়ে বিশ্রামের আরাম উপভোগ করুন।

অভ্যাসের ফলে ধীরে ধীরে বাড়বে আপনার সম্মোহনের গভীরতা। তখন ইচ্ছে করলে মেপে দেখতে পারেন কোন্ স্তরে পৌঁছেচেন। কিংবা পরীক্ষা করে দেখতে পারেন সত্যিই সম্মোহিত হয়েছেন কিনা।

সম্মোহিত অবস্থায় যে-কোন একটা হাতকে গ্যাস বেলুনের মত

হালকা করে উপরে তুলতে পারেন আপনি। এর নিয়ম হচ্ছে: সেই হাতটার ওপর মনস্থির করতে হবে। টের পাবেন হাতটা বেশ ভারি মনে হচ্ছে। কল্পনায় নিজের হাতটা দেখুন। সাজেশন দিন কিছুক্ষণের মধ্যেই ওজনহীন হয়ে পড়বে হাতটা। মনে মনে বলুন, 'হাতটা হালকা হয়ে যাচ্ছে। ক্রমে হালকা হচ্ছে আরো। ওজন চলে যাচ্ছে ওটার, একটু পরেই বাতাসে ভেসে উঠবে। হালকা হয়ে ভেসে উঠবে হাতটা, ভেসে আসবে আমার মুখের দিকে। উঁচু হয়ে উঠবে হাতটা, ভেসে এসে স্পর্শ করবে আমার মুখ। কনুইয়ের কাছে বাঁকা হয়ে যাবে হাতটা, ভেসে উঠবে উপরে, আরো উপরে, বাঁকা হয়ে স্পর্শ করবে আমার মুখ। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমার আঙুল-গুলোর স্পর্শ পাব আমি মুখে।'

লক্ষ্য করবেন, সমস্ত ওজন দূর হয়ে যাচ্ছে হাতটার। আপনা-আপনি ভেসে উঠল বাতাসে। প্রথমে আঙুলগুলো একটু নড়বে; তারপর পুরো হাতটা উঠতে শুরু করবে। সাজেশনটা বারবার বলতে থাকুন, আপনার নিজের ভাষায়। ইচ্ছে করে নড়াবেন না হাতটা, কিন্তু আপনাআপনি নড়তে চাইলে ঠেকাবারও চেষ্টা করবেন না। আপনার অবচেতন মন ওটাকে ভাসিয়ে তুলবে শূন্যে, এগিয়ে আনবে আপনার মুখের কাছে।

যদি দেখেন দু'তিন মিনিট পার হয়ে যাচ্ছে, তবু হাতটার নড়-বার কোন লক্ষণ নেই, তখন বুঝতে হবে সচেতন ভাবে বাধা দিচ্ছেন আপনি ওটাকে। কাজেই সেই সময় সাজেশন চালু রেখেই হাত-টাকে কয়েক ইঞ্চি উপরে তুলে ধরা ভাল, সেখান থেকে ওটার চার্জ বুঝে নেবে অবচেতন মন।

আপনি লক্ষ্য করবেন, যখন নড়তে শুরু করে তখন খুব ছোট ছোট ঝাঁকি লাগে হাতে। একটু উপরে উঠে গেলে ঝাঁকিটা থাকে না, সাবলীল ভঙ্গিতে এগোয় মুখের দিকে। হাতটা একবার চলতে শুরু করলে ওটা যে ঠিক কোথায় আছে সেই বোধ আপনার থাকতেও পারে, নাও থাকতে পারে। কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখবেন আঙুলগুলো ঠিক নির্দেশমত এসে স্পর্শ করেছে আপনার মুখের কোথাও। এইবার হাতটা নামিয়ে আনুন।

এছাড়া আর একটা পরীক্ষা করে দেখতে পারেন। আপনি নির্দেশ দিলে আপনার মুঠি পাকান ডান হাতটা শক্ত হয়ে যাবে, কিছুতেই বাঁকা করতে পারবেন না। যতক্ষণ না বাম হাতে স্পর্শ করছেন ডান হাত, ততক্ষণ লোহার মত শক্ত হয়ে থাকবে সেটা।

এই ধরনের পরীক্ষায় সফল হলে নির্দ্বিধায় ধরে নিতে পারেন সম্মোহনের অন্ততঃ হালকা স্তরে পৌঁছেচেন আপনি। একবার দু'বার সফল না হলে নিরুৎসাহ হওয়ার কিছুই নেই, চেষ্টা চালিয়ে গেলেই সফলতা আসবার সম্ভাবনা শতকরা পঁচানব্বই ভাগ।

সম্মোহনের মাঝারি বা গভীর স্তরে পৌঁছে ইচ্ছে করলে অঙ্গ অসাড় করে ব্যথা দূর করে দেখতে পারেন। আপনার কাল্পনিক গজকাঠির আঠারো ইঞ্চিতে পৌঁছলেই যে-কোন একটা হাতের নখ থেকে কব্জি পর্যন্ত অসাড় করে ফেলতে পারেন আপনি। সাজেশন দিন, 'নখ থেকে কব্জি পর্যন্ত অসাড় হয়ে যাচ্ছে আমার বাম হাত। খানিক পরই চিমটি দেব আমি ঐ হাতে। প্রথমে হাল্কা ভাবে চিমটি দেব, ধীরে ধীরে বাড়াব চিমটির জোর। প্রতিটি চিমটির সাথে সাথেই আরো অবশ হয়ে যাবে হাতটা। তারপর যত জোরে সম্ভব

চিমটি কাটব আমি। চাপ বোধ করব, কিন্তু কোন ব্যথা লাগবে না আমার হাতে।'

এই সাজেশন বারকয়েক বলার পর দু'মিনিট অপেক্ষা করে হালকা করে চিমটি কাটুন বাম হাতে। প্রথম চিমটিতে যদি দেখেন হাতটা সামান্য একটু অসাড় হয়েছে মাত্র, তাহলে অসাড়ত্ব বাড়বার জন্যে একটু সময় দিয়ে তারপর আবার চিমটি দিন। পুরো অসাড় হয়ে গেলে যত জোরে খুশি চিমটি দিন—চাপ লাগবে, কিন্তু ব্যথা লাগবে না।

ইচ্ছে করলে আপনি নিজেকে সাজেশন দিতে পারেন যে এই অবশ হাতে আপনি শরীরের যে অংশ স্পর্শ করবেন সেই অংশে সংক্রামিত হবে অসাড়ত্ব। এইভাবে শরীরের যে-কোন অংশ অসাড় করবার ক্ষমতা অর্জন করতে পারবেন আপনি। এই ব্যাপারে আপনার সবচেয়ে বড় বাধা হচ্ছে সন্দেহ। কোন রকম সন্দেহ, অবিশ্বাস বা তির্যক মনোভাব থাকলে আশানুরূপ ফল পাওয়া যায় না।

অঙ্গ অসাড় করবার আগে একটা নির্দিষ্ট সময় ঘোষণা করুন। একটা নির্দিষ্ট সময়ের পরে আবার অনুভব শক্তি ফিরে আসবে—এ রকম সাজেশন না দিয়ে অঙ্গ অসাড় করা ঠিক না। কারণটা আগের এক পরিচ্ছেদে বলেছি।

'আসুন, এবার আত্মসম্মোহন শিখে নেয়া যাক। তারপর আক্রমণ করব আমরা সিগারেটকে।

আত্মসম্মোহন শিক্ষা

আত্মসম্মোহন শিক্ষার জন্যে যে কথাগুলো দেয়া হচ্ছে সেগুলো রেকর্ড করবার আগে স্পষ্ট উচ্চারণে অন্ততঃ বারতিনেক জোরে জোরে পড়ুন। এরফলে রেকর্ডিংটা ভাল হবে। কণ্ঠস্বরটা যেন বেশি ওঠা-নামা না করে সেদিকে লক্ষ্য রাখবেন—মোটামুটি একঘেয়ে একটানা একটা ভাব বজায় রাখলে সম্মোহনের জন্যে সুবিধে হবে। বারদুয়েক অভ্যাসের পরই দেখবেন ধীর একটা ছন্দ পেয়ে গেছেন। সেটাই বজায় রাখুন। নিজে রেকর্ড করায় খুব অসুবিধে বোধ করলে কোন বন্ধুকে ডেকে পড়িয়ে নিন ওকে দিয়ে।

আপনার রেকর্ড প্লেয়ার থাকলে কথাগুলোর সাথে সাথে ধীর লয়ের কোন ব্যাকগ্রাউণ্ড মিউজিকও ব্যবহার করতে পারেন, তবে লক্ষ্য রাখবেন বাজনাটা যেন খুব আস্তে বাজে, কথাগুলোই মুখ্য, বাজনাটা গৌণ।

টেপ রেকর্ডের একদিকে আত্মসম্মোহন শিক্ষার সাজেশন রেকর্ড করুন, অপর পিঠে ধূমপান ত্যাগের সাজেশন রেকর্ড করবেন। ধূম-পান ত্যাগের সাজেশন দেয়া হবে আগামী এক পরিচ্ছেদে।

রেকর্ডটা শুনবার জন্যে এমন একটা স্থান ও কাল বাছাই করুন যে সময়ে বা যেখানে কোন রকম বাধা পড়বে না। আরাম করে

আরাম কেদারায় বসুন বা বিছানায় শুয়ে পড়ুন। জামাকাপড় ঢিল করে দিন। এবার স্থির দৃষ্টিতে তাকান কোন নির্বাচিত বিন্দুর দিকে। স্বাভাবিকভাবে চাইলে চোখটা যেখানে পড়ে তার চেয়ে খানিক উপরে দৃষ্টি নিবদ্ধ করা উচিত। এইবার টেপরেকর্ডার চালু করে দিন, কিম্বা আঙুলের ইশারায় বন্ধুকে বলুন পড়া শুরু করতে। আপনার সমস্ত মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করুন পাঠরত কণ্ঠস্বরের উপর। যা যা করতে বলা হচ্ছে করুন।

রেকর্ডের বিষয়বস্তু

কিছুক্ষণের মধ্যেই আশ্চর্য শিথিল এক আরামের আবেশ আসবে তোমার মধ্যে। জীবনে এত আরামের বিশ্রাম-উপলব্ধি খুব কমই হয়েছে তোমার। শরীর-মন যতই ঢিল করে দেবে, যতই শিথিল করে দেবে, ততই বেশি হবে আরাম। যেখানটায় তাকিয়ে আছো, আরো কিছুক্ষণ চেয়ে থাক সেদিকেই। লম্বা করে দম নাও একটা। তারপর ধীরে ধীরে বাতাস বের করে দাও ফুসফুস থেকে। সব বাতাস বের করে দাও। এবার আরেকটা লম্বা শ্বাস টান। আবার খালি কর ফুসফুস। হ্যাঁ, এই রকম। সব বাতাস বের করে দিয়ে আবার একটা দম নাও আগের মত। এবার স্বাভাবিক ভাবে চলতে থাক শ্বাস-প্রশ্বাস। প্রতিটা শ্বাসের সাথে সাথে আরো শিথিল হচ্ছে তোমার শরীরের সমস্ত পেশী। যা বলা হচ্ছে মন দিয়ে শোন, অন্য কোনদিকে চিত্ত বিক্ষেপ না করে একমনে শুনে যাও কথা-

গুলো। শরীর-মন শিথিল করে দাও আরো, আর শোনো।

চোখের পাতা দুটো একটু কাঁপছে হয়ত তোমার। চোখের পলক ফেলতে ইচ্ছে করলে ফেলতে পার, তবে দৃষ্টিটা যেদিকে স্থির হয়ে আছে সেদিকেই থাক আরো কিছুক্ষণ। হয়ত লক্ষ্য করছ, চোখের পাতাগুলো একটু ভারি হয়ে আসতে শুরু করেছে। ক্রমে আরো ভারি মনে হবে ওগুলো, খুলে রাখা কষ্টকর হয়ে উঠবে ক্রমে। বেশ ভারি লাগছে এখন। খানিক বাদেই বুজে আসতে চাইবে পাতা দুটো। বুজে আসতে চাইলে যে-কোন সময় চোখ বুজতে পার। একটু পরে ওগুলো এতই ভারি মনে হবে যে খুলে রাখা অসম্ভব হয়ে পড়বে, এবং আপনিই বুজে যাবে। এবার বুক ভরে আর একটা লম্বা দম নিয়ে ছেড়ে দাও। আরো শিথিল করে দাও নিজেকে। ধরে না রেখে ছেড়ে দাও, ঢিল করে দাও শরীর-মন।

আরামের আবেশ আসবে তোমার মধ্যে খানিক বাদেই। চমৎকার একটা ঘুমঘুম মোহের আবেশ। হয়ত ইতিমধ্যেই লক্ষ্য করেছ, আসতে শুরু করেছে স্বপ্নিল একটা আচ্ছন্ন ভাব। উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা, দুশ্চিন্তা সব দূর হয়ে যাচ্ছে তোমার মন থেকে। কোন কিছুরই তেমন কোন গুরুত্ব নেই, যেন কিছুতেই কিছু এসে যায় না, এমনি একটা ভাব আসছে তোমার মধ্যে। একটা ডোণ্ট-কেয়ার ভাব। চোখের পাতা দুটো হয়ত আরো বেশি কাঁপছে তোমার। যদি এখনো বুজে গিয়ে না থাকে বুজে যাক ও দুটো। চোখ বন্ধ কর। পাতাগুলো খুব ভারি লাগছে, খু-উ-ব ভারি। চোখ বুজে মন দিয়ে শোন কথাগুলো।

হয়ত অনুভব করতে পারছ হাত-পাগুলোও ভারি হয়ে এসেছে

তোমার। স্বপ্নিল আচ্ছন্ন ভাবটা বাড়ছে আরো। অদ্ভুত আরামের আবেশ আসছে। শরীরের সমস্ত পেশীগুলোকে আরো ঢিল করে দিতে হবে। পা থেকে মাথা পর্যন্ত প্রতিটা পেশী শিথিল করে দিতে হবে। একে একে ঢিল করে দাও সব।

প্রথম ডান পা থেকে শুরু করা যাক। ডান পায়ের সমস্ত পেশী শক্ত করে ফেল। খুব শক্ত। এইবার হঠাৎ ঢিল দাও। হ্যাঁ। পায়ের পাতা থেকে কোমর পর্যন্ত সমস্ত পেশী শিথিল হয়ে গেল। ডান পা ঢিল হয়ে গেল কোমর পর্যন্ত।

এবার বাম পা শক্ত করে ফেল। আরো শক্ত। হঠাৎ ঢিল দাও। হ্যাঁ। শরীরের নিচের অংশ সম্পূর্ণ শিথিল হয়ে গেল। এবার তোমার তলপেটের পেশীগুলোও শিথিল কর। তারপর বুক। আবার একবার বুক ভরে শ্বাস নিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেল। এর ফলে সারা শরীর আরো শিথিল হয়ে আসবে। ভেরি গুড। এবার পিঠের পেশীগুলো ঢিল দাও। কাঁধ আর ঘাড়ে কি একটু আড়ষ্টতা রয়ে গেছে? ঢিল দাও, শিথিল করে দাও। এবার হাত দুটো। ডানহাতের সমস্ত পেশী শক্ত কর, হঠাৎ ঢিল দাও। এবার বাম হাত। শক্ত করে হঠাৎ ঢিল দাও। কাঁধ থেকে নিয়ে আঙুলের ডগা পর্যন্ত শিথিল হয়ে গেছে হাত দুটো। আ···হ্! আরা···ম! চমৎকার লাগছে।

সারা মুখে অসংখ্য ছোট ছোট পেশী আছে, সেগুলোও ঢিল করে দাও এবার। গাল, চোয়াল, চোখ, কপাল—সব ঢিল হয়ে গেল। পরিপূর্ণ বিশ্রাম। সারা শরীর ঢিল হয়ে গেছে তোমার। আরাম লাগছে। মনের সব বাঁধন খুলে গেছে। উদ্বেগহীন, স্বপ্নিল

বিশ্রামের রাজ্যে চলে গেছ তুমি। ঝিরঝির, ঝিরঝির যেন শান্তির পরশ লাগছে তোমার গায়ে। আরো গভীর আরামের মধ্যে চলে যাচ্ছ তুমি ক্রমে। দিবা-স্বপ্নে বহুবার যেমন কল্পনায় ভর করে অন্য এক জগতে চলে গেছ, ইচ্ছে করলেই তেমনি এক জগতে চলে যাওয়া শিখছ তুমি এখন। শিখে একে অনেক কাজে ব্যবহার করবে তুমি। উপকৃত হবে।

শিথিল আরামে আচ্ছন্ন হয়েছ তুমি।

সম্মোহন আর কিছুই নয়, তুমি এখন যে অবস্থায় আছো, একেই বলে সম্মোহন।

এবার খানিকটা কল্পনার সাহায্য নিতে হবে তোমাকে। কল্পনা করে নাও একটা লম্বা সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে আছো তুমি। সামনে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছ সিঁড়ির ধাপগুলো—নেমে গেছে নিচে। রেলিংটা দেখতে পাচ্ছ স্পষ্ট। আমি দশ থেকে শূন্য পর্যন্ত গুণব এখন। আমি গুণতে শুরু করলেই তুমি কল্পনায় ধাপের পর ধাপ নামতে শুরু করবে সিঁড়ি বেয়ে। আমি যখন শূন্য গুণব তখন তুমি নেমে গেছ নিচে। নেমে যাওয়ার ছবিটা স্পষ্ট ফুটিয়ে তুলবে তুমি কল্পনায়। আমার প্রত্যেকটি গণনা তোমাকে আরো গভীর স্তরে নিয়ে যাবে। প্রত্যেকটি সংখ্যা উচ্চারণের সাথে সাথে গভীর থেকে গভীরতর স্তরে চলে যাবে তুমি। প্রতিটা ধাপ নামার সাথে সাথে আরো…আরো গভীরে তলিয়ে যাবে।

দশ। নামতে শুরু করছ তুমি। প্রতিটা সংখ্যা উচ্চারণের সাথে সাথে আরো গভীরে চলে যাও। নয়…আট…সাত…ছয়। অনেক গভীরে চলে যাচ্ছ তুমি। আরো…আরো গভীরে। পাঁচ…চার…

তিন···দুই। আরো গভীরে। এক···শূন্য। নিচে পৌঁছে গেছ তুমি, পৌঁছে গেছ অনেক গভীরে। প্রতিটা নিঃশ্বাসের সাথে সাথে চলে যাচ্ছ আরো গভীরে।

শ্বাস-প্রশ্বাসটা হয়ত লক্ষ্য করেছ। বেশ অনেক ধীরে ধীরে বইছে এখন। আগের চেয়ে বেশ অনেক গভীর ভাবে বইছে শ্বাস—অনেকটা ঘুমন্ত মানুষের মত। শান্ত একটা আরাম, একটা আয়েশের ভাব এসে গেছে তোমার মধ্যে। দেহমনের সব বাঁধন আলগা করে দাও···ডুবে যাও আরো গভীরে। প্রতিটা নিঃশ্বাসের সাথে সাথে গভীর থেকে আরো গভীরে।

তুমি এখন সম্মোহিত বিশ্রাম উপভোগ করছ। শিথিল আরামে আচ্ছন্ন হয়েছ।

তোমার হাত দুটোর প্রতি লক্ষ্য দাও। খুব সম্ভব বেশ ভারি ঠেকছে ওগুলো তোমার কাছে। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই সম্পূর্ণ ভারমুক্ত হয়ে যাবে তোমার ডান হাতটা। গোটা হাতটাই হালকা হতে শুরু করবে। অনুভব করতে পারবে ওজন চলে যাচ্ছে ওটার। কল্পনায় নিজের ডান হাতটা দেখ। আঙুলের নখ দিয়ে যেন বেরিয়ে যাচ্ছে সব ওজন। অনুভব করতে পারছ, ক্রমে হালকা হয়ে আসছে হাতটা। একটু পরেই পুরোটা হাত ওজনশূন্য হয়ে যাবে। পালকের মত হালকা হয়ে যাবে। ধীরে ধীরে শূন্যে উঠতে শুরু করবে হাতটা। যেন হাওয়ায় ভেসে ওপরে উঠতে থাকবে তোমার ডান হাত, এগিয়ে আসবে মুখের দিকে। আরো হালকা হয়ে আসছে হাতটা। ওপরে উঠতে চাইছে। গ্যাস বেলুনের মত হালকা হয়ে গেছে ডান হাতটা। এক্ষুণি অনুভব করতে পারবে শূন্যে ভেসে

উঠছে হাতটা। হয়ত ইতিমধ্যেই ভেসে উঠতে শুরু করেছে। আরো ওপরে উঠবে হাতটা…আরো। কল্পনার চোখে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছ, ভেসে উঠছে, ক্রমে এগিয়ে আসছে হাতটা তোমার মুখের কাছে। স্পর্শ না করা পর্যন্ত চলতে থাকবে হাতটা মুখের দিকে।

কনুইয়ের কাছে ভাঁজ হয়ে যাচ্ছে হাতটা। আরো ওপরে উঠছে। যদি এখনো হাতটা শূন্যে ভেসে উঠতে আরম্ভ না করে থাকে, কয়েক ইঞ্চি শূন্যে তোল ওটাকে, সামান্য একটু ভাঁজ কর কনুই। বাধা না দিয়ে ওটাকে মুখের কাছে নিয়ে আসার ভার ছেড়ে দাও তোমার অবচেতন মনের ওপর। আপনিই উঠে আসবে হাতটা, তোমার মুখের কোন অংশ স্পর্শ করে ফিরে যাবে নিজের জায়-গায়। প্রথম দিকে একটু ঝাঁকি অনুভব করবে, তারপর সহজ ভঙ্গিতে উঠে এসে স্পর্শ করবে মুখের কোথাও। আরো একটু উঠুক হাতটা।

হাওয়ায় ভেসে ওপরে উঠে আসছে তোমার হাত। ওপরে উঠছে। আরো ওপরে। এইভাবে উঠতে উঠতে মুখের কোন একটা জায়গায় স্পর্শ করবে হাতটা। আরো উঠে আসছে হাত। আরো। এবার আগের চেয়ে একটু দ্রুত উঠছে। এগিয়ে আসছে। কল্পনায় দেখতে পাচ্ছ তুমি, এগিয়ে আসছে হাতটা। আরো। যতক্ষণ না মুখ স্পর্শ করছে ততক্ষণ উঠতেই থাকবে হাতটা। হাতটা যত ওপরে উঠছে, ততই গভীরে চলে যাচ্ছ তুমি। যতই গভীরে চলে যাচ্ছ ততই ওপরে উঠছে হাত। মুখ স্পর্শ করবার সাথে সাথেই আরো অনেক গভীরে চলে যাবে তুমি। গভীর আরামের আবেশে আচ্ছন্ন হবে।

মুখ স্পর্শ না করা পর্যন্ত হাতটা ওপরে উঠবে। স্পর্শ করার পর

ফিরে যাবে নিজের জায়গায়। আরো গভীর স্তরে চলে যাচ্ছ তুমি। যেতে থাক। এই আরামের বিশ্রাম উপভোগ করছ তুমি। প্রতিটা নিঃশ্বাসের সাথে সাথে চলে যাচ্ছ গভীর থেকে গভীরতর স্তরে। এক্ষুণি হাতের স্পর্শ পাবে তুমি তোমার মুখের কোন অংশে। তখন হাতটা নামিয়ে ফেলতে পার।

প্রত্যেকটা কথা শুনতে পাচ্ছ তুমি। সবকিছু সম্পর্কেই সজাগ আছ। আরো খানিকটা ঢিল দাও, আরো খানিক গভীরে চলে যাও। যতই গভীরে যাবে ততই বেশি আরাম লাগবে। কেমন একটা ঘুম ঘুম আচ্ছন্ন ভাব অনুভব করছ তুমি এখন নিজের ভিতর। যেন কিছুতেই কিছু এসে যায় না। সমস্ত ভাবনা-চিন্তা, উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা সরে গেছে বহুদূরে। কোন কিছুতেই কিছু এসে যায় না এখন তোমার। পরিপূর্ণ বিশ্রামের আরাম ঘিরে রেখেছে তোমাকে।

এই কথাগুলো যখনই শুনবে তখনই এমনি চমৎকার আরামের গভীরে চলে যাবে তুমি। কিন্তু তোমার ইচ্ছের বিরুদ্ধে কেউ তোমাকে সম্মোহিত করতে পারবে না। যতই অভিজ্ঞতা বাড়বে ততই গভীরে চলে যেতে পারবে তুমি। তোমার মধ্যে থেকে সমস্ত মানসিক চাপ দূর হয়ে গেছে, পরিপূর্ণ বিশ্রামের কোলে নিজেকে ঢেলে দিয়েছ তুমি। আরো ডুবে যাও, আরো গভীরে। প্রতিটা নিঃশ্বাসের সাথে সাথে গভীরতর স্তরে। ক্রমে আরো গভীরে চলে যাচ্ছ তুমি।

সব ধরনের সম্মোহনই আসলে আত্মসম্মোহন। এতক্ষণ পর্যন্ত যা যা বলা হয়েছে সেই সাজেশনকে মেনে নিয়ে তুমি নিজেকে নিজে সম্মোহিত করেছ। অন্যের সাজেশনে তুমি যেমন সাড়া

দিয়েছ, নিজের সাজেশনেও ঠিক তেমনি ভাবেই সাড়া দেবে। নিজের উপকারের জন্যে তুমি নিজেকে যে সাজেশন দেবে সেটাই মেনে নিয়ে তাতে সাড়া দেবে তোমার অবচেতন মন। আত্মসম্মোহন শিখে নিয়ে তুমি ধূমপানের বদভ্যাস ত্যাগ করবার জন্যে কিছু সাজেশন দেবে। তোমার অবচেতন মন সেটা মেনে নিয়ে অনুকূল সাড়া দেবে----তোমাকে সাহায্য করবে সফল হতে। তুমি দেখবে খুব সহজেই ওটা সম্ভব।

যখন খুশি নিজেকে সম্মোহিত করবার বিদ্যা শিখছ তুমি এখন। আত্মসম্মোহনে কোন রকম বিপদের সম্ভাবনা নেই—শুধু একটা ব্যাপারে একটু সতর্ক থাকতে হবে। কোন গাড়ি বা যন্ত্র চালাতে গিয়ে যেন আত্মসম্মোহিত হয়ে না পড়, সেদিকে তোমার লক্ষ্য রাখতে হবে। নইলে বিপদ ঘটে যেতে পারে। কারণ সম্মোহিত অবস্থায় সচেতন অবস্থার মত অতটা সাবধান সপ্রতিভ থাকা অসম্ভব। তাই এখনি তোমাকে সাজেশন দিয়ে রাখছিঃ গাড়ি বা কোন যন্ত্র চালনার সময় ঘুমিয়ে পড়া বা সম্মোহিত হয়ে পড়া তোমার পক্ষে অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে। যখন গাড়ি বা যন্ত্র চালাচ্ছো তখন শুধু যে সম্মোহিত হয়ে পড়বে না তা নয়, যতক্ষণ ঐ কাজে আছো পরিপূর্ণ সজাগ, সচেতন ও সতর্ক থাকবে।

এখন যা যা করেছ প্রায় সেই সবই করতে হবে তোমাকে আত্মসম্মোহন করবার সময়। এখন যে অভিজ্ঞতা হল, এই রকমই অভিজ্ঞতা হবে। তোমাকে সহজ একটা নিয়ম বলে দেব, সেটা মনে রাখবে, ঠিক যা যা বলছি তাই করবে—তাহলে খুব সহজেই সম্মোহিত করতে পারবে নিজেকে।

এখন যেমন আরাম করে শুয়ে বা বসে আছো, তেমনি আরামে বসবে বা শোবে। দৃষ্টিটা কোন কিছুর ওপর দু'তিন মিনিট স্থির রেখে মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করবে তোমার সাজেশনের ওপর। কতক্ষণ সম্মোহিত থাকতে চাও সে সময় নির্ধারণ করে নিয়ে তোতাপাখির মত বার বার উচ্চারণ করবে তোমার সাজেশন। চোখের পাতা দুটো ভারি হয়ে এলেই তিনবার বলবে ঃ চোখ বুজে আসছে। চোখ বুজে যাচ্ছে। চোখ বুজে গেল। চোখের পাতা বন্ধ হয়ে যাবে আপনিই।

জোরে কিছু বলবার হয়ত তোমার দরকার পড়বে না, নিজেকে যা বলতে চাও সেগুলো মনে মনে ভাবলেই চলবে। কিন্তু কেউ কেউ আবার মুখে উচ্চারণ করলে বেশি ভাল ফল পায়। ইচ্ছে করলে জোরে বলে দেখতে পার ফলোন্নতি হয় কিনা। চোখ বুজে যাও-য়ার পর শরীরটাকে আরো ঢিল, আরো শিথিল করে নেবে তুমি। আজ যেভাবে করেছ ঠিক সেই ভাবে। প্রথমে পা থেকে শুরু করবে, একে একে শরীরের সমস্ত পেশী ঢিল করে দেবে। শরীরটাকে যত শিথিল করবে, ততই আরাম বোধ করবে, ততই চলে যাবে গভীরে। শরীরটা ঢিল হয়ে যাওয়ার পর ধীরে ধীরে তিনবার বলবে—'শিথিল আরামে আচ্ছন্ন হও'। এই কথাটা তিনবার বলার সাথে সাথেই সম্মোহিত হয়ে পড়বে তুমি। যখন নিজের ইচ্ছায় আত্মসম্মোহিত হতে যাচ্ছ, কেবল মাত্র তখনই এই কথাটা তোমাকে সম্মোহিত করবে। অন্য সময় এই কথাটার কোন প্রভাব পড়বে না তোমার ওপর। 'শিথিল আরামে আচ্ছন্ন হও'—কথাটা হাজার বার বললে বা শুনলেও প্রভাবিত হবে না তুমি, যদি না নিজের

ইচ্ছায় আত্মসম্মোহিত হওয়ার উদ্দেশ্যে কথাটা বল।

ধীরে ধীরে নিজেকে তিনবার বলবে ঃ 'শিথিল আরামে আচ্ছন্ন হও'। কথাটা শেষ হওয়ার সাথে সাথেই সম্মোহিত হয়ে পড়বে তুমি। এবার ডান হাতটা শূন্যে ভেসে উঠে আপনাআপনি স্পর্শ করুক তোমার মুখ। এই মর্মে সাজেশন দাও, কল্পনায় দেখ হাত্‌-টাকে উপরে উঠে আসতে, স্পর্শ করুক মুখের কোথাও। তারপর হাতটা নামিয়ে রাখ। 'শিথিল আরামে আচ্ছন্ন হও' বলবার পর ডান হাতটা উপরে উঠে তোমার মুখ স্পর্শ করা হয়ে গেলেই তলিয়ে যেতে শুরু করবে তুমি সম্মোহনের গভীরে।

তোমার পক্ষে যতটা সম্ভব ততটা গম্ভীর স্তরে পৌঁছতে হলে নিজেকে বল—'আরো গভীরে চলে যাচ্ছ তুমি'। এই কথাটা ধীরে ধীরে তিনবার বল, সেই সাথে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে যাওয়ার কাল্পনিক ছবি দেখ। এবার আর সংখ্যা গণনার দরকার নেই—খুব ধীরে তিনবার নিজেকে বল ঃ 'আরো গভীরে চলে যাচ্ছ তুমি', সেইসাথে ধাপের-পর ধাপ নেমে গভীর স্তরে চলে যাও। মনের চোখে দেখ ঘটনাটা, সিঁড়িটা দেখ, রেলিং দেখ। সিঁড়িটা কাঠের না কংক্রিটের, মোজাইক করা না সাধারণ সিমেন্ট, কয়েক ধাপ নামার পর বাঁক আছে কিনা, ওপরের ল্যাণ্ডিং থেকে কি একটা বাল্‌ব ঝুলছে?—এইসব খুঁটিনাটি আগেই ভেবে নাও, সিঁড়িটা স্পষ্ট ফুটিয়ে তোল মনের পর্দায়। প্রত্যেকটা ধাপ নামার সাথে সাথেই সম্মোহনের আরো গভীরে চলে যাবে তুমি। প্রথম দিকে অভ্যাসের সময় অন্ততঃ বারতিনেক এই সিঁড়ি বেয়ে নামা ভাল। সেক্ষেত্রে কল্পনা করে নিতে পার চারতলা থেকে নামছ তুমি,

একেক বারে একেক তলা। প্রত্যেক তলা নামার সাথে সাথে ক্রমে গভীরতর স্তরে চলে যাবে তুমি। বারদশেক অভ্যাসের পর একবার নামলেই যথেষ্ট হবে—একবারেই তোমার গভীরতম স্তরে পৌঁছে যাবে তুমি। সেখানে পৌঁছে একমনে পুনরাবৃত্তি করতে থাক তোমার সাজেশনের সার-সংক্ষেপ।

মনে রাখবে, শরীরটাকে যত শিথিল করে দেবে, ততই আরাম বোধ করবে, ততই চলে যাবে গভীরে। যত গভীরে যাবে, ততই শিথিল হবে শরীর-মন, ততই আরাম বোধ করবে। মাঝে মাঝে গভীর শ্বাস নেবে, এর ফলে আরো গভীরে চলে যাবে। এখন একবার গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলতে পারো, এর ফলে আরো গভীরে চলে যাবে তুমি।

যখন আত্মসম্মোহিত অবস্থায় রয়েছ, তখন যদি এমন কিছু ঘটে সেজন্যে তোমার জেগে ওঠা দরকার—ফোন বাজছে, কেউ দরজার কড়া নাড়ছে, কিম্বা আগুন ধরে যাওয়া বা ঐ জাতীয় কোন বিপদ উপস্থিত হয়েছে—তৎক্ষণাৎ জেগে উঠবে তুমি। পূর্ণ সজাগ, পূর্ণ সচেতন অবস্থায় ফিরে আসবে তুমি মুহূর্তে।

কিন্তু সেরকম কোন জরুরী অবস্থার সৃষ্টি না হলে যখন জেগে উঠতে চাও তখন শুধু নিজেকে একবার বলবে, 'এক থেকে পাঁচ পর্যন্ত গুণলেই জেগে উঠবে তুমি।' তারপর ধীরে ধীরে এক, দুই, তিন করে পাঁচ পর্যন্ত গুণে যাও। পাঁচ বলবার সাথে সাথেই চোখ দুটো খুলে যাবে তোমার। জেগে উঠে খুব ভাল লাগবে তোমার কাছে, মনে হবে গভীর বিশ্রাম নিয়ে উঠলে। সমস্ত ক্লান্তি দূর হয়ে গিয়ে মনে হবে সজীব, প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছ।

আত্মসম্মোহনকে অনেক কাজে ব্যবহার করে উপকৃত হবে তুমি। ধূমপান ত্যাগে একে ব্যবহার ত করবেই, নিজের আরো অনেক সমস্যা সমাধানে কাজে আসবে এই বিদ্যা। তুমি যখন যে কাজের জন্যেই সাজেশন দাও না কেন, তোমার অবচেতন মন গ্রহণ করবে সে সাজেশন এবং সেইমত কাজ করবে।

সম্মোহিত অবস্থায় অনেক সময় সময়ের হিসেব রাখা যায় না, কখনো চট্ করে অনেক সময় পার হয়ে যায়। কখনো আবার খুব বেশি ক্লান্ত থাকলে সম্মোহিত অবস্থা থেকেই স্বাভাবিক ঘুমে ঢলে পড়ে কেউ কেউ। এটা বন্ধ করতে হলে প্রথমেই একটা সময় সীমা স্থির করে নেয়া উচিত। ঠিক সময় মত তোমাকে জাগিয়ে দেয়ার ভার অবচেতন মনের উপর ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে পার। সময় হলেই সম্মোহনের যত গভীর স্তরেই থাক না কেন তোমার অবচেতন মন জাগিয়ে দেবে তোমাকে।

আত্মসম্মোহন একবার শেখা হয়ে গেলে চিরকাল রয়ে যাবে ক্ষমতাটা তোমার মধ্যে। নিয়মগুলো ভুলবে না তুমি কিছুতেই, যখনই প্রয়োজন তখনই সম্মোহিত করতে পারবে তুমি নিজেকে। তবে চর্চা একেবারে ছেড়ে না দিয়ে মাঝে মাঝে আত্মসম্মোহনের অভ্যাস রাখবে তুমি সারাজীবন। বিদ্যাটার চর্চা রাখলে শরীর-মন ভাল থাকবে তোমার।

এবার জেগে উঠবে তুমি। আমি যখন পাঁচ পর্যন্ত গুণব তখন জেগে উঠবে সম্মোহন থেকে। জেগে উঠে চমৎকার লাগবে তোমার কাছে। সজীব বোধ করবে, পরিপূর্ণ বিশ্রামের পর যে তাজা একটা খুশি খুশি ভাব হয়, সেটা অনুভব করবে তুমি। পাঁচ বলবার সাথে

সাথেই সম্পূর্ণ সজাগ অবস্থায় চোখ মেলবে তুমি। এক—সম্মোহনের গভীর থেকে উঠে আসছ তুমি। দুই—জেগে উঠছ ক্রমে। তিন—আচ্ছন্ন ভাবটা কেটে গিয়ে সজাগ হয়ে উঠছ। চার—চোখের পাতা খুলবার আগের মুহূর্তে চলে এসেছ তুমি। এরপর পূর্ণ বিশ্রামের ভাব নিয়ে, পূর্ণ সজাগ হয়ে চোখ মেলবে তুমি। পাঁচ।

প্রয়োগ

নিজে নিজে আত্মসম্মোহন করবার আগে বেশ কয়েকবার উপরের এই রেকর্ডিংটা শোনা এবং নির্দেশ মত যেখানে যখন যা করতে বলা হয়েছে করা দরকার। তারপর নিজে প্র্যাকটিস শুরু করুন। অবশ্য যদি একবার দুবার শুনেই স্থির নিশ্চিত হতে পারেন যে গভীর ভাবে সম্মোহিত হতে পারছেন, তাহলে শুরু করে দিতে পারেন আগেই। তবে নিজের মনে এ ব্যাপারে নিশ্চয়তা বোধ না এলে এটা করা ঠিক হবে না।

অভ্যাস করবার জন্যে কোন ধরাবাঁধা সময় নেই—যখন খুশি, যতবার খুশি করতে পারেন। কোন রকম ক্ষতির আশঙ্কা নেই। প্রথম কিছুদিন দিনে দু'বার বা তিনবার অভ্যাস করতে পারলে ভাল হয়। এক সপ্তাহ প্র্যাকটিসের পর আপনি তৈরি হয়ে যাবেন ধূমপান ত্যাগের ব্যাপারে এই বিদ্যা প্রয়োগের জন্যে। বার বার টেপ-রেকর্ডারের উল্লেখ করছি বলে যে আপনার একটা টেপ-রেকর্ডার

সংগ্রহ করতেই হবে বা কিনতে হবে তা নয়। আর কেউ যদি কথাগুলো আপনাকে পড়ে শোনায় তাহলেও ফল একই। তবে এক্ষেত্রে যিনি পড়বেন তাঁর আগে দু'তিনবার কথাগুলো পড়ে নেয়া দরকার। আর একটা কথা মনে রাখবেন—আপনি নিজে নিজেকে সম্মোহিত করছেন। যিনি পড়ছেন তিনি শুধু সাহায্য করছেন আপনাকে। কথাগুলো বেশ ধীরে ধীরে, স্পষ্ট উচ্চারণে, কণ্ঠস্বরে একটা একটানা একঘেয়ে ভাব এনে পড়তে বলবেন তাঁকে—নাটক করবার দরকার নেই।

আত্মসম্মোহন শিখে দারুণ এক আত্মবিশ্বাস এসে যাবে আপনার মধ্যে। কিন্তু তাই বলে হাতের কাছে যাকে পাচ্ছেন তারই উপর এ বিদ্যা প্রয়োগ করতে যাবেন না দয়া করে। নিজে নিজের কোন ক্ষতি করা যায় না, কিন্তু অন্যের উপর এটা প্রয়োগ করতে হলে মনস্তত্ত্বের উপর যথেষ্ট জ্ঞান থাকা দরকার—নইলে যাকে সম্মোহন করা হচ্ছে তার ক্ষতি হয়ে যেতে পারে। এই সম্মোহনকে আত্মসম্মোহনেই সীমাবদ্ধ রাখুন। আর কাউকে সম্মোহিত করে নিজের অজান্তেই এমন কিছু বলে বসতে পারেন যার ফলে ক্ষতি হয়ে যেতে পারে তার। আরেকজনের মানসিক অবস্থা যখন আপনার জানা নেই, তখন কি দরকার ঝুঁকি নিয়ে? নিজের উপকারের জন্যে ব্যবহার করুন একে যত খুশি—কিন্তু স্মরণ রাখবেন, এটা খেলার জিনিস নয়, ইলেকট্রিসিটির মতই প্রচণ্ড এক শক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করতে যাচ্ছেন আপনি আত্মসম্মোহনের মাধ্যমে। আগুন নিয়ে যেমন খুশি খেলবেন না।

খসড়া কর্মসূচী

এইবার আমরা ফিরে আসছি আবার ধূমপান প্রসঙ্গে। মোটামুটি একটা কর্মসূচী তৈরি করে ফেলা যাক।

আপনার প্রথম কাজ হচ্ছে আত্মসম্মোহনটা শিখে নেয়া। গত পরিচ্ছেদের রেকর্ডিংটা দিনকয়েক শুনে সপ্তাহখানেক প্র্যাকটিস করলেই শেখা হয়ে যাবে আপনার আত্মসম্মোহন। গভীরতা যেটুকু আসবে সেটা সিগারেট ছেড়ে দেয়ার কাজের পক্ষে যথেষ্ট।

নেহায়েৎ দুর্ভাগ্য না হলে আত্মসম্মোহন শিখে নেয়াটা আপনার জন্যে খুবই সহজ হবে, অল্পসময়ের মধ্যেই শিখে নিতে পারবেন আপনি। কাজেই শেখার সাথে সাথে আরো কয়েকটা প্রস্তুতি নিয়ে ফেলুন।

ঠিক কবে থেকে ছাড়বেন সেটা এখনই মনে মনে স্থির করে নেয়া ভাল। বেশি তাড়াহুড়ো করতে যাবেন না। সবচেয়ে ভাল হয় যদি পাঁচ-সাত দিনের লম্বা একটা ছুটির সময়ে ছাড়তে পারেন। সর্দি-কাশি বা ফ্লুতে আক্রান্ত হলে জানবেন ছেড়ে দেয়ার একটা ভাল সুযোগ যাচ্ছে—কারণ ঐ সময়ে সিগারেটের ধোঁয়া গিলতে তেমন

মজা লাগে না। মহিলাদের পক্ষে গর্ভাবস্থায় সিগারেট ছেড়ে দেয়া সহজ হয়। ধোঁয়াটা সে সময় খারাপ লাগে। কিন্তু ছুটি, সর্দিকাশি বা গর্ভাবস্থার জন্যে অনির্দিষ্ট কাল বসে থাকা আপনার পক্ষে সম্ভব নয়। কাজেই যে-কোন এক শনিবার ধূমপান ত্যাগের দিন ধার্য করতে পারেন। ঝট্ করে আগামী কাল বা পরশুর শনিবার দিন ধার্য করে বসবেন না—হাতে অন্ততঃ পাঁচ-ছ'টা দিন সময় রাখতে হবে আপনার, কাজ আছে।

সিগারেট ছেড়ে দিলে আপনার উপর স্নায়বিক চাপ পড়বে। এই চাপ হালকা করবার জন্যে সাজেশন ত রয়েছেই, ট্র্যাঙ্কুইলাই-যারও দরকার পড়বে আপনার। প্রথম চোদ্দদিন এটা খুবই দরকার। যে-কোন চিকিৎসককে যদি খুলে বলেন আপনার উদ্দেশ্য, তিনি আপনার উপযোগী ট্র্যাঙ্কুইলাইযার প্রেসক্রাইব করতে পারবেন। বেশির ভাগ ট্র্যাঙ্কুইলাইযারের কাজ পুরো মাত্রায় শুরু হয় কয়েকদিন পর থেকে—একটা যেই খেলেন, ওমনি কাজ শুরু হয়ে গেল, তা হয় না। কাজেই আপনি যে শনিবার সিগারেট ছেড়ে দেবেন তার অন্ততঃ পাঁচদিন আগে থেকে ট্র্যাঙ্কুইলাইযার সেবন শুরু করতে হবে আপনাকে। সোমবার থেকে শুরু করাই ভাল। চোদ্দদিন পর নার্ভাস্ টেনশন যখন কমে যাবে, আপনিও ধীরে ধীরে মাত্রা কমিয়ে ছেড়ে দেবেন ওষুধ খাওয়া।

এই ওষুধের সাথে লোবেলিন সালফেট দিয়ে তৈরি লজেন্স ব্যবহার করতে পারেন, যদি পান। ওতে নিকোটিনের শারীরিক চাহিদা দূর হয়। ওটা খাওয়া শুরু করতে হয় যেদিন ছেড়ে দিচ্ছেন তার আগের রাতে খাওয়ার পর। দিন সাতেক প্রত্যেকবার খাওয়ার

পর ওটা খেলে বেশ উপকার পাওয়া যায়। বিদেশে পাওয়া যায় এটা, বিভিন্ন কোম্পানি তৈরি করে বিক্রি করছে বিভিন্ন নামে। কিন্তু ঐ ওষুধ এদেশে পাবেন কিনা সন্দেহ। না পেলে বাদ। ওটা না হলেও চলবে আমাদের।

কিন্তু বেশ কিছু চুইংগাম আর শক্ত জাতের লজেন্স ছাড়া চলবে না। টক-মিষ্টি, মিষ্টি বা পিপারমেন্ট যুক্ত—যেমন লজেন্স আপনার পছন্দ, দিন সাতেকের খোরাক জোগাড় করে রাখুন। বাচ্চারা টের পেলে সব সাবড়ে দেবে, কাজেই লুকিয়ে রাখুন। সিগারেট ছেড়ে দেয়ার প্রথম কয়েকটা দিন এগুলো কাজে লাগবে আপনার। খুব সম্ভব তিন চারদিনেই এর প্রয়োজন ফুরিয়ে যাবে, কিন্তু প্রথম কয়েকটা দিন কিছু একটা মুখে দেয়ার তাগিদ অনুভব করলেই টপ করে একটা লজেন্স বা চুইংগাম মুখে পোরার দরকার পড়বে।

সম্ভব হলে অরেঞ্জ জুসও কিনে ফেলতে পারেন। কাজে লাগবে পরে।

কেনাকাটা শেষ, এইবার কাগজ পেন্সিল নিয়ে বসুন। কেন আপনি সিগারেট ছেড়ে দিতে চাইছেন, কারণগুলো একের পর এক সাজিয়ে লিখে ফেলুন। বিরাট এক প্রবন্ধ লিখে বসবার দরকার নেই, বাজারের লিস্টের মত একটা সংক্ষিপ্ত তালিকা তৈরি করলেই চলবে। আমি মোটামুটি একটা খসড়া তালিকা তৈরি করে দিচ্ছি, এর সাথে আপনার বিশেষ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ব্যক্তিগত আরো যেসব কারণ আছে সেগুলো যোগ করে নিন।

১। স্বাস্থ্য—ক্যান্সার, এমফিসেমা, পালমোনারী বা হার্টের অসুখের সম্ভাবনা দূর করা।

২। শারীরিক উন্নতি—ভাল থাকা, সর্দিকাশির আক্রমণ কমা, দম বাড়া।

৩। শক্তি ও উদ্যম বৃদ্ধি করা।

৪। ভাল ঘুমান।

৫। স্নায়বিক দুর্বলতা দূর করা, পরিপূর্ণ বিশ্রামের ক্ষমতা অর্জন করা।

৬। অপব্যয় রোধ করা।

৭। জামাকাপড়, টেবিলে আগুন পড়া বন্ধ করা, বাড়িতে আগুন লাগার সম্ভাবনা কমান।

৮। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা—নোংরা অ্যাশট্রে, দুর্গন্ধ, জামা-কাপড়ে ছাই পড়া, পকেটে তামাকের গুখা, ইত্যাদি বন্ধ করা।

৯। সন্তানের ধূমপায়ী হওয়ার সম্ভাবনা কমান।

১০। চিন্তাশক্তি ও মনোযোগ বাড়ান। শরীর ও মনের সজীবতা বৃদ্ধি করা।

১১। ঠোঁট ও জিভ জ্বালা বন্ধ করা। পরিষ্কার দাঁত এবং দুর্গন্ধমুক্ত নিঃশ্বাসের জন্যে।

১২। খাবারের স্বাদ বৃদ্ধি।

১৩। ঘ্রাণ শক্তি বৃদ্ধি।

১৪। জয়ী হওয়ার জন্যে। সিগারেটের দাসত্ব থেকে মুক্ত হওয়া।

এর সাথে আরো অনেক কিছু যোগ করতে পারবেন এ বইয়ের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে আর একবার চোখে বুলালে। যা যা আপনার মনে ধরে, যে সব কারণকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়, সব ঢুকান এই লিস্টে। লিখে ফেললে সিগারেট ছেড়ে দেয়ার তাগিদটা জোরদার

হবে আরো। আপনার ছেড়ে দেয়ার ইচ্ছেটা যত জোরাল হবে, ততই সহজ হবে আপনার পক্ষে এর কবল থেকে বেরিয়ে আসা। 'ছেড়ে দেয়া উচিত'—এই ভাবটার বদলে এখন আপনি 'ছেড়ে দেবো'—এই ভাবের মধ্যে ঢোকাচ্ছেন নিজেকে। কাজেই একটা তালিকা তৈরি করে ফেলা খুবই জরুরী। এই তালিকা ব্যবহার করবেন আপনি পরে।

সোমবার থেকে প্রতি সন্ধ্যায় একবার করে পড়তে শুরু করবেন আপনি আপনার তৈরি তালিকাটা। সিগারেট ছেড়ে দেয়ার সুবিধেগুলো মনের মধ্যে গেঁথে নেয়ার চেষ্টা করবেন। বার বার পড়তে পড়তে বসে যাবে ওটা আপনার মনে। যেদিন ছেড়ে দিলেন সেদিনও সন্ধ্যায় চোখ বুলাবেন তালিকায়। তারপর প্রতি দু'দিন অন্তর অন্তর একবার করে পনের দিন পড়লেই চলবে। ততদিনে তালিকার প্রত্যেকটি কথা যে সত্য সে সম্পর্কে কোনই সন্দেহ থাকবে না আপনার।

পুরনো অভ্যাস ভাঙা

যে শনিবার আপনি ছেড়ে দেয়ার দিন ধার্য করেছেন তার আগের সোমবার আপনার সিগারেটের ব্র্যাণ্ড বদলে ফেলুন। হালকা সিগারেটে অভ্যস্ত হয়ে থাকলে কড়া সিগারেট ধরুন, আপনি কড়া সিগারেট খাওয়ায় অভ্যস্ত থাকলে হালকা সিগারেটে চলে আসুন।

ক্যাপস্ট্যানপায়ী চলে যান স্টারে, স্টারপায়ী চলে যান অন্য কোন ব্র্যাণ্ডে।

শেষের দুটো দিন, অর্থাৎ বৃহস্পতি এবং শুক্রবার দ্বিগুণ করে দিন সিগারেটের সংখ্যা। আপনি যদি বিশটা সিগারেটে অভ্যস্ত থাকেন, শেষের দুটো দিন বাড়িয়ে চল্লিশটা করুন। ত্রিশটায় অভ্যস্ত হলে জোর করে খান ষাটটা···নিদেন পক্ষে পঞ্চাশটা।

মাত্রা বাড়িয়ে দিয়ে আপনি আসলে নিজেকে সিগারেটের উপর বীতশ্রদ্ধ করে তুলছেন। দ্বিগুণ করে দিলে সত্যিই মন উঠে যাবে আপনার। দেখবেন জোর খাটাতে হচ্ছে নিজের উপর বেশি খেতে গিয়ে। ইচ্ছের বিরুদ্ধে হলেও জোর করে খেতে হবে আপনার দ্বিগুণ। যখন ইচ্ছে করছে তখন ত খাচ্ছেনই, যখন ইচ্ছে করছে না তখনও খেতে বাধ্য করছেন নিজেকে। সিগারেটের উপর তীব্র একটা বিতৃষ্ণা জন্মান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার—কাজেই লক্ষ্য রাখবেন এই নির্দেশের যেন অন্যথা না হয়।

কোন অভ্যাসের দাসত্ব থেকে মুক্তি পেতে চাইলে এ ব্যাপারে নামজাদা বিশেষজ্ঞ ডঃ নাইট ডানল্যাপের পরামর্শ হচ্ছে : সচেতন ভাবে বেশ অনেকটা আতিশয্যের মধ্যে টেনে নিতে হবে নিজেকে। এর ফলে বিতৃষ্ণা জন্মাবে। বদ অভ্যাস আর কিছুই নয়—যে-কোন স্বাভাবিক অভ্যাসে আতিশয্য ঢুকলেই সেটা বদঅভ্যাসে পরিণত হয়। কিন্তু আতিশয্য যদি আরো দ্বিগুণ করে দেয়া যায়, তাহলে জন্মাবে বিতৃষ্ণা। সিগারেটের প্রতি বিতৃষ্ণা জন্মাতে হলে শেষের দুটো দিন দ্বিগুণ করে দিতে হবে আপনার ধূমপানের মাত্রা।

এই ব্যাপারে একটু সতর্ক থাকতে হবে আপনার। নইলে

খাচ্ছি, খাবো করে শেষপর্যন্ত দ্বিগুণ খাওয়া হয়ে উঠবে না আপনার। আগে যদি দিনে বিশটা খেতেন শেষের দুদিন আপনি খাচ্ছেন চল্লিশটা করে। এই চল্লিশের কতগুলো কোন্ সময়সীমার মধ্যে শেষ করতে হবে স্থির করে নিন আগেই। ধরুন, ঘুম থেকে উঠেই শুরু করছেন আপনি, সম্ভব হলে নাস্তার আগেই গোটা চারেক ধ্বংস করুন, ভাত খাওয়ার আগে লক্ষ্য রাখবেন যেন গোটা বিশেক পুড়িয়ে শেষ করা যায়, সন্ধ্যের আগেই ত্রিশে পৌঁছে যাবেন, ঘুমাবার আগে চল্লিশতম সিগারেটটা ফুঁকে তারপর বিছানায় যাবেন। নিজের উপর একটু কড়া পাহারা না দিলে দেখবেন শেষ পর্যন্ত পঁচিশ কি বড়জোর ত্রিশটার বেশি খেতে পারেননি সারাদিনে।

চল্লিশটা খাওয়ার পর ঠোঁট জিভ জ্বলে যাওয়ার উপক্রম হবে, খশখশে হয়ে যাবে মুখের ভিতরটা। তামাকের অপূর্ব সুগন্ধকে মনে হবে চুল পোড়া দুর্গন্ধ। কিন্তু কোন অবস্থাতেই ঢিল দেবেন না। পরদিন কষ্ট আরো বাড়বে, কিন্তু যত কষ্টই হোক, টেনে যান নির্দিষ্ট সংখ্যক সিগারেট। পরদিন যখন পুরো কোটা সিগারেট ফুঁকে বিছানায় ঢুকবেন, তখন সত্যিই বিতৃষ্ণায় ছেয়ে যাবে আপনার মন। তার পরের দিন, অর্থাৎ যেদিন থেকে আর খাচ্ছেন না, সেদিন সকালে মুখটা এমনই বিস্বাদ হয়ে থাকবে যে সিগারেট খাওয়ার কথা ভাবলে আতঙ্ক হবে। নাস্তার পর পুরোনো অভ্যাসবশে সিগারেট ধরাবার জন্যে হাতটা ব্যস্ত হয়ে উঠতে চাইবে। ঠিক সেই সময় স্মরণ করুন শেষ সিগারেটটা কেমন লেগেছিল। মনে মনে বলুন: 'আর নয়। ছেড়ে দিয়ে বেঁচেছি!' তারপর মনটা অন্য-

কিছুতে সরিয়ে ফেলুন, কিম্বা ব্যস্ত হয়ে পড়ুন কোন কাজে।

আপনার ছেড়ে দেয়ার নির্ধারিত দিনটির কথা ঘোষণা করে দিন। বাড়ির সবাইকে, বন্ধু-বান্ধব এবং পরিচিত সবাইকে বলুন। সম্ভব হলে মাইক নিয়ে বেরিয়ে পড়তে বলতাম রাস্তায়। সেটা ঠিক হবে না, তবু যতটা সম্ভব ছড়িয়ে দিন কথাটা। এর ফলে নিজেকে ঠেলে দিচ্ছেন আপনি এমন এক জায়গায়, যেখান থেকে ফিরে আসা খুব কঠিন। ফিরতে হলে লজ্জাবনতা নববধূর মত টুকটুকে রাঙা মুখে ফিরতে হবে। এই লজ্জা আপনাকে অনেক সাহায্য করবে ছেড়ে দিতে।

আর একটা কথা। যদি সম্ভব হয় দুঃখের সাথী আর একজন ধুমপান ত্যাগে আগ্রহী ব্যক্তি সংগ্রহ করুন। সেটা যদি পারেন এবং দুজনে যদি একসাথে ছাড়তে পারেন তাহলে অনেক কম কষ্টে ছেড়ে দেয়া সম্ভব হবে।

ছেড়ে দিচ্ছেন, কিছুটা কষ্ট হবে তাও ঠিক, কিন্তু তাই বলে মন-মরা হয়ে থাকবেন না। যা হারাচ্ছেন তার চেয়ে অনেক, অনেক-গুণ বেশি পাবেন আপনি। ভয়ের কিছুই নেই, আত্মসম্মোহনের মাধ্যমে অনেক কমিয়ে ফেলতে পারবেন আপনি সিগারেট ছাড়ার কষ্ট। তবু কষ্টের কথা বলছি এইজন্যে যে শত্রুর ক্ষমতা সম্পর্কে সমীহ এবং সুস্থ একটা মনোভাব থাকা দরকার। সিগারেট সত্যিই একটা শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বী, একে পরাজিত করা সত্যিই রীতিমত কঠিন ব্যাপার। কিন্তু অবাক হয়ে লক্ষ্য করবেন, আত্মসম্মোহনের মাধ্যমে কি আশ্চর্য সহজে জয় করছেন আপনি ওকে। খুশি হবেন নিজের অবচেতন মনের প্রচণ্ড ক্ষমতার পরিচয় পেয়ে।

কাজেই ভয়শূন্য অন্তরে নিশ্চিন্তে এগোতে পারেন আপনি। সামান্য খানিকটা কষ্ট ত হবেই। কিন্তু পড়ে পড়ে মার খাবেন না দয়া করে। মুখোমুখি সংঘর্ষে নামুন। নিজেকে ছোটখাট প্রলোভনের সামনে ফেলুন, সে প্রলোভন জয় করে নিজেকে আরো আত্ম-বিশ্বাসী করে তুলুন। সাথে ম্যাচ রাখুন, বন্ধু-বান্ধব ঠোঁটে সিগারেট লাগান মাত্র আগুন জ্বেলে ধরিয়ে দিন। মনে মনে হাসুন, জয় করেছেন আপনি। ইচ্ছে করেই অন্যের সিগারেটের ধোঁয়া নাকে টানুন—আপনি জানেন, কি জঘন্য লাগে এই তামাক পোড়া গন্ধ। নিজেকে একবারে অনেক প্রলোভনের মধ্যে না ফেলে অল্প অল্প করে সাহসটা বাড়িয়ে তুলুন।

একটা বিচ্ছিরি বদভ্যাসকে দুর করছেন আপনি, ঝেঁটিয়ে বিদায় করছেন আপনার জীবন থেকে। এটা একটা মস্ত বড় কাজ। বোঝার উপর শাকের আঁটি চাপাতে যাবেন না। সিগারেটের সাথে চা, মদ ইত্যাদি ছাড়বার চেষ্টা করা বোকামি। আপনি যদি চান, এক এক করে সবই করতে পারবেন, কিন্তু একসাথে সব কোনদিন হয় না। একসাথে সব আত্মোন্নয়ন—যেমন, ব্যায়াম করে শরীরটাকে দুরস্ত করা, মেদ কমান, মিষ্টি খাওয়া কমান, মদ ছাড়া, সিগারেট ছাড়া কোনদিনই সম্ভব নয়। এ ব্যাপারে বেশি উচ্চাকাঙ্ক্ষী হতে গেলে সব একসাথে হুড়মুড় করে ধসে পড়বে আপনারই ঘাড়ে। কাজেই যখন সিগারেট ছাড়ছেন, সিগারেটই ছাড়ুন—আর সব ব্যাপারে নিজেকে প্রশ্রয় দিন। ব্যানানা স্প্লিট বা মধু বাদাম আইস-ক্রিম ভাল লাগে? খান যত খুশি। চকলেট ভাল লাগে? খান। পোলাও কোর্মা? কোন বাধা নেই—চালান। অন্যান্য কষ্ট ঘাড়

পেতে নিয়ে সিগারেট ছাড়ার কষ্টকে বাড়িয়ে তুলবেন না। অন্যান্য সব ব্যাপারে প্রশ্রয় দিন নিজেকে। বহু বছরের একটা বদভ্যাসের মূলোৎপাটন করছেন আপনি—যে পর্যন্ত না ফাঁড়াটা কাটিয়ে উঠ-ছেন, ততদিন পর্যন্ত কোন রকমের চাপ দেবেন না নিজের উপর।

আপনার মানসিক প্রস্তুতি হয়ে গেছে, আত্মসম্মোহন শেখা হয়ে গেছে—এবার কাজে নামতে হবে। ধূমপান ত্যাগের সাজেশন পাবেন আগামী এক পরিচ্ছেদে, সেটা আত্মসম্মোহন শিক্ষার রেক-র্ডিং এর উল্টোপিঠে রেকর্ড করে নিন, কিম্বা নিজেকে সম্মোহিত করে কাউকে দিয়ে পাঠ করান। যদি আপনি শতকরা পাঁচজন দুর্ভাগ্যবানের একজন হয়ে থাকেন, যদি আত্মসম্মোহন শিখতে না পারেন, তবু ঐ সাজেশনগুলো বার বার শুনলে সিগারেট ছেড়ে দেয়া আপনার পক্ষে অপেক্ষাকৃত সহজ হবে।

কেউ কেউ এতদূর পড়ার পরও, সম্মোহন সম্পর্কে এতকিছু জানার পরও, এটা যে সম্পূর্ণ নিরাপদ এক প্রক্রিয়া সেটা বোঝার পরও ভয় পেতে পারেন আত্মসম্মোহিত হতে। কি আর করা। তাদের শুধু এইটুকুই বলব, আত্মসম্মোহিত হতে না চান, না হবেন, সাজেশনগুলো শুনুন—তাতেই কাজ হবে। সম্মোহিত অবস্থায় সাজেশন গ্রহণ করতে অবচেতন মনের খুব সুবিধে হয় ঠিকই, কিন্তু বিনা সম্মোহনেও কাজ হয় সাজেশনে, যদি বারবার শোনা যায়। বিজ্ঞাপনই তার প্রমাণ। অতএব যাঁরা সম্মোহিত হতে চান না, তাঁরাও ধূমপান ত্যাগের সাজেশন বারকয়েক শুনলে যথেষ্ট উপকৃত হবেন।

আমরা জানি, আমাদের আচার-ব্যবহার-অভ্যাসকে অনেক

খানি নিয়ন্ত্রণ করে আমাদের অবচেতন মন। জানি, অবচেতন মনের উপর প্রভাব বিস্তারের সবচেয়ে ভাল উপায় হচ্ছে সাজেশন। এ-ও জানি, অবচেতন মনের কাছে কোন সাজেশন পৌঁছে দেয়ার সবচেয়ে ভাল মাধ্যম হচ্ছে সম্মোহন। ধূমপান একটা অভ্যাস (বা বদভ্যাস)। তাই ধূমপান ত্যাগে সাহায্য নিচ্ছি আমরা আত্মসম্মোহনের।

ধূমপান ত্যাগের ব্যাপারে আগামী এক পরিচ্ছেদে যে সাজেশন দেয়া হয়েছে সেটা পড়ে দেখলেই বুঝতে পারবেন, প্রথমে আমরা আপনার সিগারেট খাওয়ার ইচ্ছেটা দূর করতে চাইছি। তারপর আপনার ছেড়ে দেয়ার ইচ্ছেটাকে জোরালো করে তুলছি। অন্যেরা আপনার সামনে সিগারেট টানলে যেন আপনার মধ্যে কোন প্রতিক্রিয়া না হয় সে ব্যবস্থা করছি। কেউ সিগারেট সাধলে যেন আপনার চিত্ত চঞ্চল না হয়, সে ব্যবস্থা করছি। সিগারেটের বিজ্ঞাপন দেখে বা শুনে আপনি যেন প্রভাবিত না হন, সে ব্যবস্থা করছি। কারো বিরূপ কোন মন্তব্য যেন আপনাকে দুর্বল না করতে পারে, তারও ব্যবস্থা আছে।

যে শনিবার আপনি ছেড়ে দিচ্ছেন তার আগের সোমবার থেকে প্রতিদিন এই সাজেশন শুনতে শুরু করুন। সিগারেট ছেড়ে দেয়ার পরও তিন-চারদিন বা প্রয়োজন মনে করলে আরো বেশি দিন শুনতে হবে আপনাকে এই সাজেশন। তারপর সপ্তাহ খানেক পর পর আবার একবার করে শুনলে ভাল ফল পাবেন। আমি যা বলেছি প্রতিটা শব্দই যে আপনার রাখতে হবে তার কোন মানে নেই, ইচ্ছে করলে নিজের পছন্দমত ভাষা বা বক্তব্য যোগ বিয়োগ করে

পরিবর্তন করে নিতে পারেন। আপনার বিশেষ ক্ষেত্রে যে বক্তব্য বিশেষ ভাবে প্রযোজ্য তার সাথে আরো দু'চার কথা যোগ করে ওটাকে আরো জোরাল করে নিতে পারেন, যেটা মোটেই প্রযোজ্য নয় সেটা বাদ দিয়ে দিতে পারেন।

আত্মসম্মোহনের আর একটা সুবিধে হচ্ছে দিনের মধ্যে একটি বার অন্ততঃ শরীরটা সম্পূর্ণ শিথিল করে দিচ্ছেন আপনি। শরীরটা শিথিল থাকলে মনের মধ্যে উত্তেজনা, উদ্বেগ বা উৎকণ্ঠা আসা সম্ভব নয়। ফলে সিগারেট খাওয়ার প্রয়োজনও কমে যাচ্ছে। ছেড়ে দেয়ার পরও কিছুদিন আত্মসম্মোহিত অবস্থায় সাজেশনগুলো শুনতে বলার আর একটি উদ্দেশ্য হচ্ছে এর ফলে আপনার স্নায়বিক উত্তেজনা অনেকখানি হ্রাস পাবে, ফলে সিগারেট খাওয়ার ইচ্ছেও প্রশমিত হবে অনেকটা।

সোম থেকে শনিবার

সোমবার

১। কেনাকাটাগুলো সেরে ফেলুন। চুইংগাম, লজেন্স ত আছেই, সম্ভব হলে লোবেলিন সালফেটের লজেন্স সংগ্রহ করুন। ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী আপনার জন্যে উপযুক্ত ট্র্যাঙ্কুইলাইযার কিনে ফেলুন।

২। ডাক্তারের উপদেশ মত ট্র্যাঙ্কুইলাইযার সেবন শুরু করুন

আজই। কখন খাবেন, কি পরিমাণ খাবেন জেনে নিন ডাক্তারের কাছ থেকে।

৩। যতজনকে পারেন বলুন যে আপনি আগামী শনিবার ধূমপান ছেড়ে দিচ্ছেন।

৪। সিগারেটের ব্র্যাণ্ড পরিবর্তন করুন।

৫। সিগারেট ছেড়ে দেয়ার কারণগুলোর একটা লিস্ট তৈরি করুন। সন্ধ্যার সময় তালিকাটা পাঠ করুন, নতুন কিছু মনে এলে যোগ করুন।

৬। ঘুমের আগে বা আপনার জন্যে যে-কোন উপযুক্ত সময়ে আত্মসম্মোহিত হয়ে ধূমপান ত্যাগের সাজেশন শুনুন টেপরেকর্ডারের মাধ্যমে বা কোন বন্ধু-বান্ধবের কণ্ঠে।

৭। রেকর্ডে যেসব কথা নেই অথচ আপনার উপকারে লাগতে পারে, সম্মোহিত অবস্থায় এমন কোন কথা মনে এলে সেটাও মনে মনে বারকয়েক বলুন।

৮। কাল্পনিক ছবি দেখুন। এমন কোন পরিবেশ কল্পনা করে নিন যে অবস্থায় আপনি সবার সাথে সিগারেট খেতে অভ্যস্ত—সবাই খাচ্ছে, কিন্তু আপনি সিগারেট খাচ্ছেন না। কল্পনা করুন, আপনাকে সিগারেট সাধছে কেউ—আপনি প্রত্যাখ্যান করছেন।

মঙ্গল ও বুধবার।

১। ট্র্যাঙ্কু ইলাইযার সেবন করুন।

২। তালিকাটা পাঠ করুন।

৩। আত্মসম্মোহন করুন। সাজেশন শুনুন। নিজের বক্তব্য যোগ করুন।

৪। কল্পনায় ছবি দেখুন।

বৃহস্পতি ও শুক্রবার

১। ট্র্যাঙ্কুইলাইযার সেবন করুন।

২। তালিকা পাঠ করুন।

৩। আত্মসম্মোহন করুন। সাজেশন শুনুন। নিজের বক্তব্য যোগ করুন।

৪। কল্পনায় ছবি দেখুন।

৫। ধূমপানের পরিমাণ দ্বিগুণ করে দিন।

৬। শুক্রবার রাতে ঘুমাতে যাওয়ার আগে যদি কোন বাড়তি সিগারেট আপনার কাছে রয়ে যায়, নষ্ট করে ফেলুন, কিম্বা ফেলে দিন।

৭। শুক্রবার রাতে খাবার পর একটা লোবেলিন সালফেট লজেন্স খান।

৮। ঘুমাবার আগে দাঁত মেজে নিন।

শনিবার

১। ঘুম থেকেই উঠেই এক গ্লাস অরেঞ্জ জুস, শরবৎ অথবা পানি পান করুন।

২। দাঁত মাজুন।

৩। নাস্তার পর পরই আবার দাঁত মাজুন।

৪। ট্র্যাঙ্কুইলাইযার সেবন করুন।

৫। লোবেলিন সালফেট লজেন্স সেবন করুন প্রতিবার খাওয়ার পর।

৬। যখনই প্রয়োজন বোধ করবেন চুইংগাম বা লজেন্স যখন

যেটা ইচ্ছে হবে খান।

৭। খাওয়ার সময় বেশিক্ষণ ধরে চিবিয়ে খান।

৮। সিগারেট খাওয়ার ইচ্ছে হলেই মনটা অন্য কিছুর মধ্যে সরিয়ে নিন, কিছু একটা কাজ শুরু করুন। বড় করে দম নিন, কয়েক সেকেণ্ড দমটা ধরে রাখুন, তারপর নিঃশ্বাস ফেলুন।

৯। সন্ধ্যার দিকে আপনার তালিকা পাঠ করুন।

১০। আত্মসম্মোহন করুন। সাজেশন শুনুন। নিজের বক্তব্য যোগ করুন।

১১। মানস চোখে কাল্পনিক ছবি দেখুন।

শনিবার থেকে পরবর্তী চোদ্দ দিন শনিবারের রুটিনই অনু-সরণ করে যান। তবে সপ্তাহখানেক পর থেকে ৯, ১০, ১১ এই তিনটি বিষয়ে একটু ঢিল দিতে পারেন। একেবারে ছেড়ে না দিয়ে যখন প্রয়োজন বোধ করবেন তখন এই তিনটে বিষয়ে একটু ঝালিয়ে নিলেই চলবে।

ইচ্ছে করলে?

ছেড়ে ত দিলেন। তারপর?

তারপর থেকে যে কয়দিন ধূমপানের ইচ্ছেটা তীব্র থাকছে, রোজ সকালে ঘুম থেকে উঠেই একগ্লাস অরেঞ্জ জুস, শরবৎ বা পানি পান করুন। বিছানা ত্যাগ করবার সাথে সাথেই। তারপর দাঁত মেজে নাস্তা করুন। নাস্তার পর আবার দাঁত মাজুন। খাও-য়ার পর দাঁত মাজলে সিগারেটের ইচ্ছেটা কাটিয়ে ওঠা সহজ হবে।

তারপর?

ইচ্ছে হবে। কতটা জোরাল ইচ্ছে হবে সেটা নিশ্চয় করে বলা যায় না. একেকজনের ক্ষেত্রে এটা হবে একেক রকম। কেউ কেউ দেখবেন, ইচ্ছেটা বেমালুম গায়েব হয়ে গেছে। সিগারেট খাওয়ার ইচ্ছেটাই অনুপস্থিত, কাজেই খাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। সবার ক্ষেত্রেই এরকম হলে বড় ভাল হত। কিন্তু তা হয় না।

বেশির ভাগের মনেই খানিক পরে পরে উঁকি ঝুঁকি মারবে সিগারেট খাওয়ার ইচ্ছে। সাজেশনের ফলে ইচ্ছেটা ততটা জোরাল

হবে না, কিন্তু হবে। সবচেয়ে বেশি ইচ্ছে হবে খাওয়ার পর, অথবা ঠিক যখন এক কাপ চা খাচ্ছেন, তখন। অন্যান্য সময়েও আসবে ইচ্ছে। বিশেষ করে কোন রকম ভাবাবেগ উপস্থিত হলে প্রবল ইচ্ছে হবে ধূমপানের। যদি চিন্তা করেন আগামী একমাসে কতবার কত ইচ্ছে আপনাকে দমন করতে হবে, তাহলে আতঙ্ক উপস্থিত হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু যদি সব সময় স্মরণ রাখেন যে একবারে শুধু একটা মাত্র সিগারেট খাওয়ারই ইচ্ছে আসবে, তার বেশি নয়—তাহলে সেই একটাকে দমন করা আপনার পক্ষে সহজ হবে। একটা ইচ্ছে দমন করা কিছুই নয়। একে একে টিপে মারতে হবে আপনার ইচ্ছেগুলো—ক্রমে কমে আসবে ইচ্ছে, দূর হয়ে যাবে প্রাবল্য। দূর হয়ে যাবে বদভ্যাস।

বিশেষ কয়েকটা সিগারেট—যেমন নাস্তার পর চায়ের সাথে, রাতে খাওয়ার পর, কিম্বা বাথরুমে যাওয়ার আগে যেটা ধরাচ্ছেন—খুব বেশি কষ্ট দেবে মনে করে ভয় পাওয়ার কিছুই নেই। আসলে ছেড়ে দেয়ার পর দেখবেন ঐ সব সময়ে সিগারেট খাওয়ার ইচ্ছে অন্য সময়ের চেয়ে যে বেশি হয়, তা নয়। ভয় ওগুলোকে নয়। আসল ভয় হঠাৎ ইচ্ছেকে।

বহু বছর ধরে লালন করেছেন আপনি এই বদভ্যাসকে, লাই দিয়ে মাথায় তুলেছেন। কিছুদিন চুপচাপ থেকে হঠাৎ অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে এটা আপনার ঘাড়ে। যে-কোন দুর্বল মুহূর্তে অসতর্ক অবস্থায় আক্রমণ করে বসতে পারে। এমন সব বিদঘুটে সময়ে এই আক্রমণ আসে যে কল্পনাও করা যায় না যে ঐ উদ্ভট সময়ে অত প্রবল ইচ্ছে জাগ্রতে পারে। হয়ত চমৎকার একটা সিনেমা

দেখছেন, কিম্বা রোববারের সকালে তন্দ্রাচ্ছন্ন ভাবে একটু বেশি বেলা পর্যন্ত গড়াগড়ি খাচ্ছেন বিছানায়, কিম্বা স্নান করছেন মনের সুখে, ধূমপানের প্রশ্নই ওঠে না—কিন্তু ঠিক এই রকম সময়েই ঝপ করে ঠেসে ধরে সিগারেট খাওয়ার ইচ্ছে। এতই তীব্র ইচ্ছে জাগে যে নিজের অজান্তেই সিগারেট ম্যাচ খুঁজতে শুরু করে হাত দুটো। ঠিক সময় মত ইচ্ছেটার কান চেপে না ধরলে পদস্খলন ঘটে যেতে পারে। এটা অনেকটা আগুনের মত, ঠিক সময় মত শুরুতেই টিপে নিভিয়ে দিন, নয়ত দাউদাউ করে জ্বলে উঠবে, ছারখার করে দেবে সব। যদি মনে মনে ইচ্ছেটাকে নিয়ে নাড়াচড়া করেন, যদি এটা নিয়ে ভাবেন—একটা টান দিতে পারলে মন্দ হত না—তাহলেই গেলেন। কিছুতে একে পাত্তা দিলে চলবে না। ইচ্ছেটা মাথা চাড়া দিয়ে উঠবার আগেই এক থাবড়া দিয়ে বসিয়ে দিতে হবে ওটাকে। সঙ্গে সঙ্গে চিন্তা করুন 'না। ছেড়ে দিয়েছি। কিছুতেই খাব না আর। খেলেই বিচ্ছিরি লাগবে।' বার তিনেক বুক ভরে শ্বাস নিন।

মনটা অন্য কিছুতে সরিয়ে নিন। চট্ করে একটা লজেন্স বা চুইংগাম মুখে পুরুন। অন্য যে-কোন কিছু ভাবতে শুরু করুন—পাশের বাড়ির মেয়েটা, আজকের ফুটবল ম্যাচ, বাগানের কলাগাছ-টা…যা খুশি। মনটা অন্য কিছুতে নিয়ে গেলেই দেখবেন সিগারে-টের ইচ্ছেটা দূর হয়ে গেছে। দিন যত যাবে, ততই কমতে থাকবে এই ইচ্ছের অত্যাচার, ক্ষীণ হতে হতে মিলিয়ে যাবে শেষে। যত-দিন সেটা না হচ্ছে এই বইটা হাতের কাছে রাখুন—প্রয়োজন বোধ করলেই পাতা উল্টে আপনার দাগ দেয়া জায়গাগুলোয় আবার একবার চোখ বুলান। ভাল কথা, আপনার কাছে যে সব কথা গুরুত্ব-

পূর্ণ বলে মনে হবে তার নিচে পেন্সিল বা কলম দিয়ে দাগ দিয়ে রাখতে ভুলবেন না। এতে অনেক সুবিধে হবে পরে।

প্রথম কয়েকটা দিন প্রলোভন থেকে দূরে থাকাই ভাল। যেদিন ছেড়ে দিচ্ছেন, লক্ষ্য রাখবেন, যেন আপনার হাতে আর একটা সিগারেটও রয়ে না যায়। কিছু হাতে রেখে দেয়ার মানে হচ্ছে আপনি আশা করছেন বিফল হতে পারেন, তাই তেমন প্রয়োজন পড়লে যেন বিপদে না পড়েন সেজন্যে কিছু রেখে দিচ্ছেন। এই যদি হয় তাহলে বুঝতে হবে আপনার প্রস্তুতি পর্বে গোলমাল আছে। আপনি যে ছেড়ে দিতে পারেন সে বিশ্বাসই জন্মেনি আপনার মধ্যে। বইটা আবার পড়ুন। আবার শুরু করুন গোড়া থেকে। ছেড়ে দেয়ার চেষ্টা করে লাভ নেই—'চেষ্টা' কথাটার মধ্যেই অন্তর্নিহিত রয়েছে আপনার নিজের প্রতি সন্দেহ, আপনি আশা করছেন বিফলও হতে পারেন। এভাবে সফল হতে পারবেন না কোনদিনই। একটা সিগারেট কাছে রয়ে যাওয়া মানেই প্রলোভন। একটাও না থাকলে হঠাৎ ইচ্ছে জাগলেও খেতে পারছেন না, ইচ্ছেটা দমন করবার সুযোগ পাচ্ছেন।

অন্যান্য সবদিকে প্রশ্রয় দিন নিজেকে—চকোলেট খান, ইগলু খান, সিনেমা দেখুন, চমৎকার একজোড়া জুতো বা শার্ট কিনুন—যা খুশি ; কিন্তু দয়া করে সিগারেট খাওয়ার ইচ্ছেটাকে একবিন্দু প্রশ্রয় দেবেন না। যতবার এই কুৎসিত ইচ্ছেটা আপনার কাছে পরাজিত হবে, ততই দূরে সরে যাবে। কিন্তু একেবারে দূর হতে অনেক সময় নেবে। অনেকদিন পর পর আবার সেই পুরনো যুক্তিতর্ক ফিরে আসতে চাইবে নব উদ্যমে। হঠাৎ হঠাৎ মনে হবে সিগারে-

টের ধোঁয়ার গন্ধটা বড় ভাল ত ! মনে হবে, সিগারেট না খাওয়াটা কেমন যেন স্মার্টনেসের অভাব। মনে হবে, এখন আর আপনি সিগারেটের দাস নন, এখন ইচ্ছে করলেই সিগারেটকে নিজের দাস বানিয়ে রাখতে পারেন, ইচ্ছে করলেই এক-আধ সময় এক-আধটা সিগারেট খেতে পারেন, কম খেলে ক্ষতির সম্ভাবনা কোথায় ?

ভুলেও একাজ করবেন না ! একটা খেলেই গেলেন। কিছুদিন পর আবার ফিরে যেতে হবে আপনাকে আগের অবস্থায়। অনেকে বাহাদুরি দেখাতে গিয়ে ঠকে গেছে। এতদিন পর একটা খেলে কেমন লাগে দেখতে গিয়ে, কিম্বা এক-আধটা খেলে আমার কিছুই হয় না সেটা দেখাতে গিয়ে বিপদে পড়েছে অনেকে। আবার সিগারেটের দাসে পরিণত হয়েছে কয়েক দিনের মধ্যেই। দয়া করে এ কাজ করবেন না। যে সময় ব্যয় করে, যতটা কষ্ট করে সিগারেট ছেড়েছেন, এত আয়োজন সব হেলায় ভাসিয়ে দেবেন না বানের জলে।

মনে রাখবেন, আপনার সাথে ধূমপায়ীর তফাৎ শুধু একটা সিগারেট। আমি নিজে তিন বছর না খেয়ে থাকার পর একটা খেয়ে দেখতে গিয়েছিলাম, কেমন লাগে। প্রথমটা মোটেই ভাল লাগেনি, মন খুলে হেসেছিলাম, ভেবেছিলাম এইবাজে জিনিস মানুষ খায় কি করে ? কিন্তু সেই দিনই কয়েক ঘণ্টা পর আবার মনে হল, আর একটা খেলে কেমন লাগে দেখি ত ! পরদিন দেখি আবার ইচ্ছে হয়। বিশ্বাস করুন, এক মাসের মধ্যে ফিরে গিয়েছিলাম আমি আবার দৈনিক পঁচিশটায়।

আপনার সচেতন প্রচেষ্টা ত রয়েছেই, তার উপর আত্মসম্মো-

হনের মাধ্যমে সাজেশন দিয়ে অবচেতন মনকে নিয়ন্ত্রিত করে তারও সাহায্য নিচ্ছেন সিগারেট ছাড়তে গিয়ে। অন্যের তুলনায় অনেক কম কষ্ট হবে আপনার। দু'সপ্তাহ পর নিজেই অবাক হয়ে যাবেন কষ্টের স্বল্পতা দেখে।

প্রথম তিনটে দিন একটু কষ্ট হয়। এই তিনটে দিন পার করতে পারলেই জানবেন আসল ফাঁড়া কেটে গেছে। তারপর মাঝে মাঝে, দিনের মধ্যে এক আধবার ইচ্ছে জাগতে পারে, ওগুলোকে দমন করা অনেক সহজ হয়ে যায়। সপ্তাহ খানেক পর দেখবেন ইচ্ছের জোর এতই কমে গেছে যে মোটেই বেগ পেতে হচ্ছে না আর। যতই দিন যাবে ততই কমে যাবে ইচ্ছে, দু'সপ্তাহ পার হয়ে গেলে দেখবেন আরো কমে আসছে। তখন দু'তিনদিন পার হয়ে যাবে—একবারও মনে আসবে না সিগারেটের কথা।

ততদিনে নিজের পিঠ চাপড়ে বাহবা দেবেন আপনি নিজেকে। বুকটা ফুলে উঠবে আরো দু'ইঞ্চি। যারা ধূমপান করছে তাদের কৃপার দৃষ্টিতে দেখতে শুরু করছেন। পরিষ্কার বুঝতে পারছেন ওরা কেমন চাকর-খাটছে সিগারেটের। আপনি ছেড়ে দিতে পেরেছেন সেজন্যে গর্বিত হওয়ার মধ্যে অন্যায় কিছুই নেই। যারা ছাড়তে পারছে না তারা ঈর্ষা বোধ করবে আপনার প্রতি, সেটাও স্বাভাবিক। কিন্তু তাই বলে বোলচাল আর উপদেশ দিয়ে আপনার ধূমপায়ী বন্ধু-বান্ধবকে অতিষ্ঠ করে তুলবেন না যেন আবার।

বইয়ের শেষ পরিচ্ছেদে আপনার সুবিধের জন্যে চোদ্দ দিনের একটা দিনপঞ্জী তৈরি করে দিচ্ছি। দয়া করে ওটা আগেই পড়ে ফেলবেন না।

সিগারেট ছেড়ে দেয়ার দিন থেকে প্রতিদিন একেকটা অংশ পড়ুন। প্রথম দিনের জন্যে যা লেখা আছে সেটা প্রথম দিন পড়ুন, দ্বিতীয় দিনেরটা দ্বিতীয় দিন। আগে থেকে সব পড়ে ফেললে এর কার্যকারিতা কমে যাবে।

সিগারেট ছেড়ে দেয়ার পর আগামী চোদ্দ দিনের কোন্‌দিন কি আশা করতে পারেন, ঠিক কি ধরনের বিপদ মোকাবিলা করতে হতে পারে, সে ব্যাপারে আপনাকে সতর্ক করে দেয়া হবে ওখানে। কিভাবে বিপদ কাটিয়ে উঠবেন সে ব্যাপারেও পরামর্শ দেয়া হবে।

সবার ক্ষেত্রে যে একই অভিজ্ঞতা হবে তার কোন নিশ্চয়তা নেই, তবে ওখানে যেভাবে সাজান হয়েছে মোটামুটি ভাবে সেই রকমেরই অভিজ্ঞতা হবে আপনার। আমার বিশ্বাস এ থেকে দারুণ ভাবে উপকৃত হতে পারবেন আপনি যদি না প্রথম দিনেই সব পড়ে ফেলেন। যেদিনের জন্যে যেটা লেখা হয়েছে সেদিন শুধু সেটাই পড়ুন, তার বেশি নয়।

আগামী পরিচ্ছেদে ধূমপান ত্যাগের সাজেশন দিয়েই আমরা চলে যাব শেষ পরিচ্ছেদে।

ধূমপান ত্যাগের সাজেশন

যে শনিবার আপনি সিগারেট ছেড়ে দিচ্ছেন তার পাঁচদিন আগে, অর্থাৎ আগের সোমবার থেকে প্রতিদিন অন্ততঃ দু'বার করে আত্ম-সম্মোহিত হয়ে রেকর্ডের বিষয়বস্তু শুনতে হবে আপনার। টেপ রেকর্ডের মাধ্যমে হোক বা কোন বন্ধু-বান্ধবের কণ্ঠস্বরেই হোক দিনে একাধিকবার শুনুন সাজেশনগুলো। ছেড়ে দেয়ার পরও মাঝে মাঝে এটা শোনা ভাল।

সাজেশনগুলো পরিবর্তনযোগ্য। আপনি দিনে ঠিক কয়টা সিগারেট খান—সিগারেট খান, না পাইপ, চুরুট, হুঁকো বা বিড়ি খান, নাকি টোবাকো কিনে নিজেই সিগারেট বানিয়ে খান—আমার জানা নেই। আপনার জন্যে ঠিক যেসব কথা প্রযোজ্য সেসব কথা যোগ করে নিন, যেগুলো প্রযোজ্য নয়, বাদ দিয়ে দিন। যদি মনে করেন এখানে যা বলা হয়েছে সেই সাথে আরো কিছু বলা দরকার—সে-সব জুড়ে দিন উপযুক্ত জায়গায়। ভাষাটা যদি কোথাও আপনার কানে কটু ঠেকে, বদলে নিন। মোটকথা সাজেশনগুলো

আপনার মনের মত করে নিন। প্রথমে আমি যা লিখেছি সেটা মন দিয়ে পড়ে ফেলুন একবার। দ্বিতীয়বার পাঠের সময় যেখানে যেখানে পরিবর্তন দরকার তার নিচে দাগ দিন, মার্জিনে সংক্ষেপে একটা দুটো শব্দ লিখে রাখুন সংকেত হিসেবে। তারপর পরিবর্তিত সাজেশনটা স্পষ্ট হস্তাক্ষরে লিখে ফেলুন নিজে একবার। বার কয়েক পাঠাভ্যাস করে নিয়ে রেকর্ড করুন।

যত বেশিবার শুনবেন এই সাজেশনগুলো, ততই ভাল ফল পাওয়া যাবে। আপনি জানেন, অবচেতন মনকে দিয়ে কিছু গ্রহণ করাতে হলে পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন আছে। কাজেই বারবার শুনে মনের মধ্যে বসিয়ে নিন কথাগুলো।

রেকর্ড হয়ে যাওয়ার পর যখনই আপনি আত্মসম্মোহিত হয়ে সেটা শুনবেন, তখন আগে থেকেই টেপ রেকর্ডারটা হাতের কাছে এমন জায়গায় তৈরি অবস্থায় থাকা দরকার, হাত বাড়িয়ে অন্ করলেই যেন চালু হয়ে যায় সেটা। রেকর্ড চালু করে দিয়ে হাতটা আবার আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনুন—শরীর-মন শিথিল করে মন দিয়ে শুনে যান কথাগুলো।

রেকর্ডের বিষয়বস্তু

এই আত্মসম্মোহিত অবস্থায় বিনা কষ্টে বা সামান্য কষ্টে ধূমপান ত্যাগের ব্যাপারে কিছু সাজেশন গ্রহণ করতে পারবে তুমি। আমার কণ্ঠস্বর শুনতে শুনতে আরো খানিক গভীরে চলে যাও। প্রতিটা

নিঃশ্বাসের সাথে তলিয়ে যাবে তুমি গভীর থেকে গভীরতর স্তরে। নিজেকে এইভাবে ঢিল করে ছেড়ে দিয়ে আরাম বোধ করছ তুমি। যতই গভীরে যাবে ততই বেশি আরাম বোধ করবে। কাজেই আরো শিথিল করে দাও দেহমন। আমার কণ্ঠস্বর শুনতে শুনতে তলিয়ে যাও আরো গভীরে। বাইরের আর সমস্ত শব্দ থেকে বিচ্ছিন্ন করে নাও মনটা—তোমার সমস্ত মনোযোগ কেন্দ্রীভূত কর আমার বক্তব্যে। আর কোন কিছুরই কোন মূল্য নেই, গুরুত্ব নেই। মন দিয়ে শোন কথাগুলো। শরীর-মন শিথিল করে দিয়ে মন দিয়ে শুনে যাও।

এই সাজেশনগুলো দেয়া হচ্ছে তোমাকে সাহায্য করার জন্যে। প্রতিটা কথা বলা হচ্ছে তোমার উপকারের জন্যে। কেউ তোমাকে সিগারেট ছেড়ে দিতে বাধ্য করছে না। ছেড়ে না দিয়ে তুমি সিগারেটের মাত্রা দ্বিগুণ বাড়িয়ে দিলেও কারো কিছু বলবার নেই। কিন্তু দ্বিগুণ বাড়াতে তুমি চাও না, সিগারেট ছেড়ে দিতে চাও।

কেউ কেউ সিগারেট ছেড়ে দিয়ে বিমর্ষ হয়ে পড়ে বা বদমেজাজী হয়ে পড়ে। এর কারণ তারা সত্যি সত্যিই সিগারেট ছাড়তে চায় না, মনে করে ছেড়ে দিতে পারলে ভাল হত, ছেড়ে দেয়া উচিত। তাই ছাড়তে গিয়ে মেজাজ খারাপ হয়ে যায় তাদের। যারা ছাড়তে চায় না, তাদের জন্যে ছেড়ে দেয়াটা খুবই কঠিন, সর্বক্ষণ সিগারেটের কথাই চিন্তা করে—ফলে ধূমপানের প্রবল ইচ্ছে জাগে তাদের মধ্যে। এর ফলে ভেতর ভেতর দারুণ উত্তেজিত হয়ে থাকে তারা, না খেতে পেয়ে আফসোস আসে, মেজাজ ঠিক রাখতে পারে না। কিন্তু যেহেতু তুমি সত্যিই সিগারেট ছেড়ে দিতে চাও, কারো আদেশে নয়—নিজের ইচ্ছায়; সেহেতু তুমি

এই উত্তেজনা বোধ, অনুশোচনা বা বদমেজাজ থেকে মুক্ত থাকবে। বরং ছেড়ে দেয়ার ব্যাপারে মনস্থির করতে পারায় খুশিই হবে তুমি। তোমার মধ্যে ওসবের পরিবর্তে শান্ত স্নিগ্ধ একটা ভাব আসবে। মাথার উকুন দুর হলে যেমন মানুষ খুশি হয়, তেমনি খুশি হবে তুমি। বিষাক্ত ক্ষত, খুজলি বা পাঁচড়ার হাত থেকে নিষ্কৃতি পেলে যেমন হাঁপ ছেড়ে বাঁচে, তেমনি হাঁপ ছেড়ে বাঁচবে। কারণ সিগারেট মাথার উকুন বা শরীরের বিষাক্ত ক্ষতের চেয়েও জঘন্য এক জিনিস।

ধূমপান যখন শুরু করেছিলে তখন হয়ত বন্ধু-বান্ধব আর সবাই যারা খাচ্ছে তাদের সমাজে স্থান করে নেয়া তোমার একটা উদ্দেশ্য ছিল। সবাই যা করে সেটা করে সবার মত হওয়ার বাসনা ছিল। হয়ত সিগারেট খেয়ে বড় হবার চেষ্টা করেছিলে তুমি। কিম্বা নিছক রোমাঞ্চকর কাজ হিসেবে নিয়েছিলে এটাকে, নিষিদ্ধ ফলের মতই আকর্ষণ ছিল তখন জিনিসটার। এটা খাওয়াকে মনে হয়েছে পুরু-ষালী, মনে হয়েছে চালাক-চতুরের লক্ষণ।

কিন্তু এখন ত তুমি বড় হয়েছ। কাজেই সিগারেটকে অন্য দৃষ্টিতে দেখবার ক্ষমতা জন্মেছে তোমার মধ্যে। বন্ধু-বান্ধব বা নিজের কাছে আর প্রমাণ করবার দরকার নেই যে তুমি বড় হয়েছ। প্রমাণ করবার দরকার নেই যে তুমি চালু ছেলে। প্রমাণ করবার দরকার নেই যে তুমি পুরুষ মানুষ। কেউ বাধা দিচ্ছে না, কাজেই নিষিদ্ধ কিছু করার আনন্দও আর নেই এর মধ্যে। এখন পরিষ্কার বুঝতে পারছ সিগারেট খেলেই আর কেউ বড় হয়ে যায় না, ওসব ছিল অপরিণত মনের অপরিণত চিন্তা।

এতদিন সিগারেট খেয়েছ, মনে হয়েছে খেয়ে তৃপ্তি পাচ্ছ। কিন্তু সত্যিই কতটা তৃপ্তি পাওয়া যায় সিগারেট খেলে? কর্কশ ধোঁয়াটা কি বুকের মধ্যে টেনে নিচ্ছ ভাল লাগে তাই? বাজি ধরে বলা যায়, সেজন্যে নয়। তুমি কি সত্যিই মজা পাও সিগারেট খেয়ে? যথেষ্ট সন্দেহ আছে তাতে। ভাল করে ভেবে দেখলে দেখবে ভাল লাগার মত কিছুই নেই ধূমপানে, বরং খারাপ লাগার মত আছে অনেক কিছু। তুমি সিগারেট খেয়েছ আনন্দের জন্যে নয়, কষ্ট এড়াবার জন্যে। অনেক চেষ্টায় এই কষ্টকর অভ্যাসে অভ্যস্ত করেছ তুমি নিজেকে, এখন যে চাহিদা আসছে সেটা তোমাকে আনন্দ দেয়ার জন্যে নয়, অভ্যাস হয়ে যাওয়ায় না খেলে কষ্ট হচ্ছে, সেই কষ্ট দূর করবার জন্যে খেতে হচ্ছে। কষ্টটা না হলে না খেয়ে সুখী হতে পারতে।

চোখে ধোঁয়া গেছে কোনদিন তোমার? সিগারেট খেতে গিয়ে নিশ্চয়ই কোন সময় ধোঁয়া লেগেছে চোখে। মনে আছে, কেমন জ্বালা করে উঠেছিল চোখটা তখন, পানি বেরিয়ে এসেছিল। এই ধোঁয়াই তুমি প্রাতিদিন সাত-আটশো বার টেনে নিচ্ছ তোমার ফুসফুসে। তোমার ফুসফুসের টিশুতে গিয়ে ঠিক এই একই রকম কষ্ট দিচ্ছে সিগারেটের ধোঁয়া। চোখে সামান্য একটু ধোঁয়া লেগেই কেমন জ্বালা করে উঠছে। তোমার ব্রোঙ্কিয়াল টিউব আর লাঙ-টিশু চোখের মতই অত্যন্ত স্পর্শকাতর। ভেবে দেখ প্রতিদিন বিশ-ত্রিশটা সিগারেটের ধোঁয়া গিয়ে কি অবস্থা করছে ওগুলোর। এরই জন্যে খুক খুক কাশি হচ্ছে, আত্মরক্ষার জন্যে অতিরিক্ত শ্লেষ্মা সৃষ্টি করছে টিশুগুলো।

কোন কাজে সফল হলে মানুষ সুখী হয়। কাজটা যতই কঠিন হয়, সফল হলে ততই সুখ হয়। ধূমপান ত্যাগের ব্যাপারে সফল হলে অত্যন্ত আনন্দ হবে তোমার। সফল তুমি হবেই। সিগারেট খাওয়ার চেয়ে ছেড়ে দেয়ায় অনেক বেশি সুখ হবে তোমার। সিগারেট ছেড়ে দিতে পারাটা এক বিরাট কাজ, ছেড়ে দিয়ে গর্ব হবে তোমার। কিন্তু ছাড়তে গিয়ে দেখবে যতটা কষ্ট হবে ভেবেছিলে তার কিছুই হল না, অবাক হয়ে যাবে অতি সহজে ছেড়ে দিয়েছ দেখে।

সত্যি বলতে কি, ভাল দিক আসলে কিছুই নেই সিগারেটের। না আছে সুস্বাদ, না আছে সুগন্ধ। কোন কোন সময় তোমার হয়ত মনে হয়েছে স্নায়বিক উত্তেজনাটা দমন করা গেছে সিগারেট খেয়ে, কিন্তু একটা সিগারেট শেষ করার কিছুক্ষণের মধ্যেই আবার দেখা দিয়েছে স্নায়বিক উত্তেজনা। উত্তেজনার যেটুকু প্রশমন হয়েছিল সেটা সাময়িক।

সিগারেট ছেড়ে দেয়ার আগের দুটো দিন, যখন দ্বিগুণ করে দেবে তুমি ধূমপানের মাত্রা তখন খেয়াল করলেই বুঝতে পারবে বেশি সিগারেট খাওয়ার ফলে কেমন নার্ভাস বোধ করছ। আর যখন সিগারেট খাওয়ার প্রয়োজন থাকবে না তখন মস্ত বাঁচা বেঁচে যাবে তুমি। সপ্তাহখানেকের মধ্যে সমস্ত নিকোটিন দূর হয়ে যাবে তোমার শরীর থেকে, তখন দেখবে আশ্চর্যজনক হারে কমে গেছে তোমার নার্ভাস টেনশন, অদ্ভুত একটা সুখের বোধ আসবে তোমার মধ্যে।

শনিবার এগিয়ে আসছে। হয়ত একটু ভয় ভয় করছে তোমার।

হয়ত ভয় লাগছে খুবই কষ্ট হবে সিগারেট ছাড়তে। মনের মধ্যে কিছুটা দ্বিধার ভাব আসাই স্বাভাবিক। কিন্তু যতই কাছে এগিয়ে আসবে দিনটা ততই তীব্র হবে তোমার মধ্যে সিগারেটের কবল থেকে মুক্তি পাওয়ার বাসনা। যতই দিন ঘনিয়ে আসবে ততই দ্বিধামুক্ত হবে তুমি, ততই নিশ্চিত হবে, খুব সহজেই বেরিয়ে আসতে পারবে তুমি এই বদভ্যাসের শৃঙ্খল ছিন্ন করে। যতবার এই কথাগুলো শুনবে তুমি ততই আরো বেশি করে নিশ্চিত হবে—পারবে তুমি। ততই বিশ্বাস হবে তোমার, খুব কম কষ্টেই ছেড়ে দেয়া সম্ভব। ততই সিগারেট ছেড়ে দেয়ার সঙ্কল্প তোমার দৃঢ়তর হবে।

আগে যদি কখনো ছেড়ে দেয়ার চেষ্টা করে থাক, হয়ত খুব কষ্ট হয়েছিল, সিগারেটের অভাবে এতই খারাপ লেগেছিল যে ছাড়তে পারনি চেষ্টা সত্ত্বেও। হয়ত সর্বক্ষণ সিগারেট খাওয়ার ইচ্ছে এসে জ্বালাতন করেছে, সিগারেটের চিন্তা ছাড়া আর কিছু ভাবতে দেয়নি—বাধ্য করেছে আবার সিগারেট খেতে। কিন্তু এবার তুমি সম্পূর্ণ অন্যভাবে আক্রমণ করছ সমস্যাটাকে। এমন সব বিদ্যা ও কৌশলের সাহায্য নিচ্ছ যার সাহায্যে অসংখ্য ধূমসেবী অতি সহজে ছেড়ে দিয়েছে সিগারেট। এবারের কথা সম্পূর্ণ আলাদা।

এবার সম্মোহনের সাহায্য নিচ্ছ তুমি, প্রচণ্ড ক্ষমতাশালী অবচেতন মনের সাহায্য পাচ্ছ। সিগারেট খাওয়ার ইচ্ছে আসবে এবারও, কিন্তু এতই হালকা ও দুর্বলভাবে যে অতি সহজেই তাড়িয়ে দিতে পারবে তুমি সেটাকে। তোমার অবচেতন মন এবার যতটা

সম্ভব দূরে সরিয়ে রাখবে সিগারেটের ইচ্ছে এবং ঐ নিয়ে ভাবনা-চিন্তা, কমিয়ে দেবে তীব্রতা। তোমার অবচেতন মন জানে এবং বোঝে যে সিগারেট তোমার জন্যে খারাপ, সব দিক থেকে ক্ষতি হচ্ছে তোমার ধূমপানের ফলে।

তুমি সিগারেট ছেড়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছ। এই সিদ্ধান্ত গ্রহণের পিছনে তোমার প্রচুর কারণ ও যুক্তি রয়েছে। সে-সব নিয়ে এখানে সংক্ষেপে একটু আলোচনা করা যাক, যাতে তোমার অবচেতন মন পরিষ্কার ভাবে বুঝতে পারে সেসবের যৌক্তিকতা, বুঝতে পারে সত্যিই ধূমপানের ফলে কতটা ক্ষতি হচ্ছে তোমার!

তোমার ছেড়ে দেয়ার প্রধান কারণ অবশ্যই স্বাস্থ্য। তুমি জান, বিশদ অনুসন্ধানের পর নিশ্চিত ভাবে জানা গেছে যে সিগারেট খেলে লাঙ ক্যান্সার হয়। পাইপ বা চুরুট খেলে ঠোঁটে ক্যান্সার হয়। তুমি জান, সিগারেট খেলে ব্রঙ্কাইটিস হয়, এমফিসেমা হয়। তোমার যে এসব অসুখ হবেই তা যদিও নয়, কিন্তু সম্ভাবনা বেড়ে যাচ্ছে কয়েকগুণ। কোন ছোঁয়াচে রোগ যেমন তুমি স্বেচ্ছায় নিজের মধ্যে সংক্রামিত করতে চাও না—তেমনি তুমি চাও না স্বেচ্ছায় সিগারেট ফুঁকে ঐ সব ভয়ঙ্কর রোগের সম্ভাবনা সৃষ্টি করতে। সিগারেট ছেড়ে দিলে তোমার এসব রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বহুলাংশে দূর হয়ে যাবে। কাজেই বর্জন করতে যাচ্ছ তুমি সিগারেটের অভ্যাস।

তোমার যদি সন্তান থাকে, তার এসব অসুখে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা হোক সেটা নিশ্চয়ই তোমার কাম্য নয়? তুমি এখন সিগারেট খাওয়ার কুফল সম্পর্কে ওয়াকিফহাল। যদি কোন ভাবে আবার কৈশোরে ফিরে যাওয়া যেত এবং বর্তমান জ্ঞানটাও সাথে নিয়ে

যাওয়া সম্ভব হত— তাহলে কিছুতেই সিগারেটের পাল্লায় পড়তে না। কিন্তু সেটা সম্ভব নয়। তুমিও ফিরে যেতে পারবে না কৈশোরে, তোমার বর্তমান জ্ঞানও কোন কিশোরের মধ্যে আশা করা বৃথা। অথচ তুমি চাও না তোমার সন্তান এই কুৎসিত বদভ্যাসের দাসত্ব করুক। শিশুরা পিতা-মাতাকে অনুকরণ করবেই। তোমার সন্তানের পক্ষে অল্প বয়সে সিগারেট ধরাই স্বাভাবিক। সে যেন তোমার এই বদভ্যাসের দৃষ্টান্ত অনুসরণ না করে সেজন্যে তোমার সিগারেট ছেড়ে দেয়া অবশ্য কর্তব্য।

তাছাড়া খরচের ব্যাপারটাই বা কম কিসে? দৈনিক দশ টাকার সিগারেট খেলে আগামী ত্রিশ বছরে তুমি খাবে কম পক্ষে এক লক্ষ আট হাজার টাকার সিগারেট। এর সাথে অনায়াসে আরো বিয়াল্লিশ হাজার টাকা যোগ করা যায় অ্যাশট্রে, ম্যাচ, সিগারেট হোল্ডার, লাইটার, পোড়া শার্ট ইত্যাদি খরচ ধরলে। এর সাথে সর্দি-কাশি-ইনফ্লুয়েঞ্জা এবং অন্যান্য অসুখের ওষুধ বাবদ খরচ ধরলে অঙ্কটা আরো অনেক বড় হয়ে যাবে, কিন্তু এসব বাদ দিলেও সিগারেট ছেড়ে না দিলে আগামী ত্রিশ বছরে দেড় লক্ষ টাকা তুমি পুড়িয়ে নষ্ট করতে। কাজটা নিঃসন্দেহে বোকামি, যদি ভাল মত ভেবে দেখা যায়। অল্প অল্প করে অনেকদিন ধরে খরচ হয় বলে গায়ে লাগে না—কিন্তু এই মুহূর্তে যদি একজন বোকা মানুষকে দেড় লাখ টাকা দিয়ে দেয়া যায়, হাজার অনুরোধ উপরোধ সত্ত্বেও সে ওগুলো পুড়িয়ে ফেলতে রাজি হবে না। আগামী ত্রিশ বছরে যে টাকা তুমি পুড়িয়ে নষ্ট করতে সে টাকা সিগারেট ছেড়ে দেয়ার পর তোমার নিজেরই উপকারে আসবে, নিজেরই ভোগে লাগবে।

ছেড়ে দেয়ার পর কথা বলার সময় তোমার মুখ থেকে তামাক পোড়া কটু গন্ধ বেরোবে না, নিঃশ্বাসের দুর্গন্ধ দূর হয়ে যাবে, জামা কাপড় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকবে, আঙুলের খয়েরী দাগ মুছে যাবে, দাঁতগুলো ঝকঝকে দেখাবে।

আরো অনেক উপকার পাবে তুমি। তৃপ্তিকর গাঢ় ঘুম হবে, স্বাস্থ্য ভাল হবে, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়বে, বেশিবার কাজ করবার ক্ষমতা আসবে, মুখের স্বাদ বেড়ে যাওয়ায় খাওয়ার মজা বাড়বে, স্নায়বিক উত্তেজনা দূর হয়ে যাবে—এমনি আরো অনেক উপকার পাবে তুমি সিগারেট ছেড়ে দিলে।

খেতে ভাল লাগবে, কিন্তু তাই বলেই যে বেশি খেতে হবে, তা নয়। বেশি খেয়ে মোটা হয়ে যাওয়ার কোন ভয় থাকবে না যদি আগে যতটা খেতে ততটাই আগের চেয়ে অনেক বেশিবার চিবিয়ে খাও। আগের সম পরিমাণ খেয়েই পরিপূর্ণ তৃপ্তি লাভ করবে তুমি, বরং আগের চেয়ে অনেক বেশি তৃপ্তি লাভ করবে বেশি করে চিবিয়ে খাওয়ায়।

যদি সিগারেট খাওয়ার ইচ্ছে জাগে, সাথে সাথেই সেটাকে বিপদসঙ্কেত ধরে নেবে তুমি। ওটাকে মনের মধ্যে লালন না করে সঙ্গে সঙ্গে দূর করে দেবে তুমি। মনে মনে বলবে, 'না। ছেড়ে দিয়েছি। কিছুতেই খাবো না আর। খেলেই বিচ্ছিরি লাগবে।' এই কথাগুলো বলতে বলতে বুক ভরে শ্বাস নেবে তিন বার। পর মুহূর্তে কোন কাজে বা অন্য কোন চিন্তায় মগ্ন হয়ে যাবে। ইচ্ছেটা তক্ষণে দূর হয়ে যাবে। সিগারেট ছেড়ে দেয়ার পর যতই দিন যাবে ততই কমে যাবে, দুর্বল হয়ে যাবে ইচ্ছেটা, ততই কম ঘন ঘন

আসবে। তোমার বিশেষ ক্ষেত্রে হয়ত দেখবে সিগারেট ছেড়ে দেয়ার পর থেকে একটিবারও আর সিগারেট খাওয়ার ইচ্ছে জাগেনি মনের মধ্যে। কারো কারো মধ্যে সিগারেট ছেড়ে দেয়ার সাথে সাথেই সিগারেটের চাহিদা দূর হয়ে যায়, কোন রকম ইচ্ছে এসে বিরক্ত করে না। তোমার বেলায়ও সেটা হতে পারে।

শনিবার সকালে ঘুম থেকে উঠে আনন্দ বোধ করবে তুমি গত দুদিনের বর্ধিত ধূমপানের অত্যাচার থেকে রেহাই পেয়েছ বলে। একগ্লাস অরেঞ্জ জুস বা শরবত বা পানি খাবে বিছানা ছেড়েই। তারপর দাঁত মাজবে। নাস্তার পর আবার দাঁত মাজবে। খুশি বোধ করবে তুমি—তুমি এখন আর ধূমপায়ী নও। চির বিদায় দিয়েছ তুমি সিগারেটকে। নোংরা কুঅভ্যাসটাকে দূর করে দিয়েছ ঝেঁটিয়ে।

অন্যেরা তোমার সামনে সিগারেট খাবে—আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, অপরিচিত লোক। ওদের সিগারেটের ধোঁয়া নাকে গেলে কোন ভাবান্তর আসবে না তোমার মধ্যে। অন্যের খাওয়া সিগা-রেটের ধোঁয়া ভাল লাগবে না তোমার কাছে, কিন্তু এতটা খারাপ লাগবে না যাতে মেজাজ খারাপ হয়ে যায়। বরং সাধারণ একটা গন্ধের মত মনে হবে ওটা তোমার কাছে। উপেক্ষা করবে তুমি গন্ধটাকে।

অন্যদের সিগারেট খেতে দেখলে স্বাভাবিক ভাবেই নিজেকে বড় মনে হবে তোমার। ওরা পারেনি, কিন্তু তুমি পেরেছ ছাড়তে। যারা অনর্গল সিগারেট টেনে ভুশভুশ ধোঁয়া ছেড়ে চলেছে তাদের-কে বোকা মনে হবে তোমার—কিন্তু ওদের ব্যাপার ওরা বুঝুক,

তোমার মাথা ব্যথার কিছুই নেই এমনি একটা মনোভাব আসবে তোমার মধ্যে। কৃপার দৃষ্টিতে দেখবে তুমি ওদের, একটু করুণাও হবে বেচারাদের জন্যে। তোমার মত উচিত সিদ্ধান্ত নিতে পারলে ওরাও ছেড়ে দিত।

সিগারেট ছেড়ে দেয়ার সাথে ইচ্ছে-শক্তির কোন সম্পর্ক নেই। ইচ্ছে-শক্তির কোন প্রয়োজনও নেই। দরকার শুধু ছেড়ে দেয়ার সঙ্কল্প। এই সঙ্কল্পের সাথে ছেড়ে দেয়ার সত্যিকার তাগিদ থাকলেই সিগারেটের নাগপাশ থেকে বেরিয়ে আসা সহজ কাজ। আত্মসম্মোহনের মাধ্যমে সাজেশন দেয়ার ফলে তোমার সঙ্কল্প এবং তাগিদ দুটোই অনেক জোরাল হয়ে উঠবে। তুমি সিগারেট ছেড়ে দিতে সঙ্কল্পবদ্ধ, নিজের মধ্যে সিগারেটের চাহিদা সম্পূর্ণ নির্মূল করতে সঙ্কল্পবদ্ধ। একবার যখন সঙ্কল্প করেছো, সহজেই প্রমাণ করতে পারবে যে-কোন অভ্যাসের শৃঙ্খলের চেয়ে তোমার শক্তি অনেক বেশি। তোমার ক্ষমতার কাছে সিগারেট কিছুই না। ধূমপান ত্যাগ করতে চাও তুমি, আগামী শনিবার ছেড়ে দেবে, যদি ইতি-মধ্যেই ছেড়ে দিয়ে থাকো, গত শনিবার ছেড়ে দিয়েছ তুমি। যতই দিন যাবে, ছেড়ে দেয়ার ইচ্ছে, এই বদভ্যাসকে জয় করবার সঙ্কল্প আরো বেশি জোরাল হবে তোমার মধ্যে।

এবার সম্মোহনের আরো একটু গভীরে চলে যাও। আরো শিথিল করে ছেড়ে দাও নিজেকে। কল্পনার সাহায্যে তোমার কয়েকজন বন্ধু-বান্ধবকে জীবন্ত করে তোল। কয়েকজন বন্ধুর সাথে কোথাও বসে গল্পগুজব করছ তুমি। একটা চেয়ারে হেলান দিয়ে আরাম করে বসে আছো তুমি, কথাবার্তা হচ্ছে। সহজ, স্বতঃস্ফূর্ত

ভঙ্গিতে হাসছ তুমি। কয়েকজন সিগারেট খাচ্ছে। ওদের আঙুলের ফাঁকে জ্বলন্ত সিগারেট দেখতে পাচ্ছ তুমি, মুখের কাছে চলে যাচ্ছে হাত, ঠোঁটের ফাঁকে সিগারেট নিয়ে টানছে গাল কুঁচকে। একজন একটা প্যাকেট খুলে এগিয়ে ধরছে তোমার দিকে। মাথা নেড়ে প্রত্যাখ্যান করছ তুমি। হাসিমুখে বলছ সিগারেট খাও না তুমি। ছেড়ে দিয়েছ।

দৃশ্যটা পরিবর্তন করে নিজের কার্যক্ষেত্রের কোন একটা দৃশ্য কল্পনা কর। কয়েকজন সহকর্মী, সহপাঠী বা সম-ব্যবসায়ীর সাথে কোথাও বসে দরকারী কথাবার্তা বলছ। এদের মধ্যে কয়েকজনের হাতে জ্বলন্ত সিগারেট, একজনের ঠোঁটের কোণে ঝুলছে একটা… ধোঁয়া বেরোচ্ছে তার থেকে, আর একজন ম্যাচ জ্বেলে ধরিয়ে নিল একটা সিগারেট। তুমি সিগারেট খাচ্ছ না দেখে তোমার দিকে প্যাকেট এগিয়ে দিল একজন, সাধল। আবার মাথা নেড়ে প্রত্যাখ্যান করছ তুমি। হাসিমুখে বলছ সিগারেট খাও না তুমি। ছেড়ে দিয়েছ। শুনে সবাই তোমাকে বাহবা দিচ্ছে, বলছে—কাজের কাজ করেছ একটা।

কেউ তোমাকে সিগারেট ছাড়তে বাধা করছে না। তুমি ছেড়ে দিচ্ছো বা দিয়েছ, কারণ ছেড়ে দেয়ার সঙ্কল্প নিয়েছ তুমি সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবে, নিজের ইচ্ছায়। সহজ যুক্তিতে পরিষ্কার বুঝতে পেরেছ ছেড়ে দেয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। কোন রকম অনুশোচনা আসবে না তোমার মধ্যে, বরং ছাড়তে পেরে সুখী ও আনন্দিত হবে। বদভ্যাসটার উপর নিজের জয় প্রতিষ্ঠা করে সন্তুষ্টি বোধ করবে, তুমি। প্রতিটা খণ্ডযুদ্ধে ওকে পরাজিত করে গর্ব বোধ

করবে তুমি। প্রতিটা খণ্ডযুদ্ধে ওকে পরাজিত করে গর্ব বোধ করবে, জয়ের আনন্দ উপভোগ করবে।

এই বইয়ে তোমাকে সিগারেট ছেড়ে দেয়ার ব্যাপারে যেসব নিয়ম, কৌশল ও সাজেশন দেয়া হয়েছে সেগুলো মনে রাখবে তুমি, সেইমত কাজ করবে। দিন দিন সিগারেট ছেড়ে দেয়ার সঙ্কল্প দৃঢ়তর হচ্ছে তোমার মধ্যে। ছেড়ে দেয়ার সাথে সাথে আরো দৃঢ় হবে তোমার সঙ্কল্প। সিগারেট খাওয়ার কথা চিন্তা করতেও বিস্বাদ লাগবে তোমার কাছে। সিগারেটের স্বাদ ও গন্ধের কথা ভাবলেও বিচ্ছিরি লাগবে। শনিবার থেকে, তুমি জান, জীবনে কোনদিন আর খাবে না তুমি সিগারেট। সিগারেটের দাসত্ব থেকে মুক্তি লাভ করে মস্ত হাঁপ ছেড়ে বাঁচবে। জানবে, সিগারেটের পাট চুকে গেছে চিরতরে, এর কু-প্রভাব থেকে বেরিয়ে এসেছ তুমি। জন্মের মত।

তোমার অবচেতন মন ধূমপানের ইচ্ছে দূর করবার ব্যাপারে সব রকম সাহায্য করবে তোমাকে, সিগারেটের চিন্তা এলে তাড়িয়ে দিতে সাহায্য করবে। তুমি দেখবে সিগারেট ছেড়ে দেয়া তোমার পক্ষে খুবই সহজ হবে। ছেড়ে দেয়ার পরদিন থেকেই ছেড়ে দেয়ার সুফল উপলব্ধি করতে শুরু করবে একে একে—চমৎকার ঘুমাবে, জিভের স্বাদ আর নাকের ঘ্রাণশক্তি বাড়বে, কাজের ক্ষমতা বেড়ে যাবে, শরীরটা ভাল ঠেকবে অনেক, নার্ভাস টেনশন দূর হয়ে যাবে, ঠাণ্ডা মাথায় পরিষ্কার চিন্তা ভাবনা করে কাজ করতে পারবে। তুমি চাও না সিগারেট খেতে। ধূমপানের কু-অভ্যাস সম্পূর্ণ দূর হয়ে গেছে বা যাবে তোমার।

চমৎকার শিথিল বিশ্রামের আবেশে আচ্ছন্ন রয়েছ তুমি এখন।

যতই প্র্যাকটিস করবে ততই আত্মসম্মোহনের গভীরতর স্তরে পৌঁছতে পারবে তুমি। শুধু ধূমপান ত্যাগের ব্যাপারেই নয়, নিজের উপকারের জন্যে তুমি যখন যে সাজেশন দেবে সব মেনে নিয়ে সেইমত কাজ করবে তোমার অবচেতন মন।

সহজেই ধূমপান ত্যাগ করতে পারবে তুমি অবচেতন মনের সাহায্য নিয়ে, সম্পূর্ণ দুর হয়ে যাবে ধূমপানের ইচ্ছে, দুর হয়ে যাবে বদভ্যাস।

এবার যখন ইচ্ছে জেগে উঠতে পার তুমি। যখনই জেগে উঠতে চাইবে, মনে মনে এক থেকে পাঁচ পর্যন্ত গুণবে। পাঁচে পৌঁছবার সাথে সাথেই পূর্ণ সজাগ হয়ে চোখ মেলবে তুমি।

পরিশেষ

এই বইয়ের শেষ পরিচ্ছেদে পৌঁছেছি আমরা। বেশ কাটল সময়টা, তাই না? আমি উপভোগ করেছি আপনার কাল্পনিক সঙ্গ। এ ক'টা দিন কল্পনা করে নিয়েছিলাম, টেবিলের ওপাশে আমার দিকে মুখ করে বসে আছেন আপনি, আমি কথা বলে যাচ্ছি, আপনি শুনছেন। আমার আন্তরিকতার কোন অভাব ছিল না, কিন্তু নীরব শ্রোতা পেয়ে হয়ত অনেক বেশি কথা, অনেক বাজে কথা বলে ফেলেছি—নিজ গুণে ক্ষমা করে দেবেন। তবে আমার বিশ্বাস, আপনার প্রতি আমার শুভেচ্ছা সম্পর্কে আপনার মনে কোন রক্-মের সন্দেহ নেই। আপনার কাল্পনিক উপস্থিতি, আপনার সঙ্গ, ভাল লেগেছে আমার—এই বইয়ের মাধ্যমে আমার বাস্তব উপ-স্থিতি আপনার কাছে কেমন লাগল সেটা জানতে পারব না আমি কোনদিন। যাই হোক, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।

এবার আগামী চোদ্দ দিনের দিনপঞ্জী। প্রত্যেকটা দিন আলাদা আলাদা ভাগ করে দিচ্ছি—দয়া করে যেদিনেরটা সেদিনই পড়ুন, এগিয়ে যাবেন না।

প্রথম দিন

বেশ একটু উত্তেজিত থাকবে আজ আপনার দেহ-মন। বারকয়েক ইচ্ছে হবে সিগারেট খাওয়ার, কিন্তু সেগুলোকে দূর করে দিতে অসুবিধে হবে না তেমন। একটু বেশি আবেগপ্রবণ থাকবেন আজ। মনে হবে কেমন একটা ঘোরের মধ্যে আছেন যেন। অন্যের সিগারেটের ধোঁয়া আজ ভাল লাগবে না মোটেই।

দুপুরের খাওয়াটা আজ চমৎকার লাগবে। রাতের খাওয়াটা আরো ভাল লাগবে।

অন্যান্য দিনের তুলনায় একটু আগেই ঘুম আসবে আজ।

বেশি দেরি না করে আজ একটু তাড়াতাড়িই ঘুমিয়ে পড়ুন।

দ্বিতীয় দিন

সকালে ঘুম থেকে উঠে অবাক হয়ে যাবেন গত রাতের ঘুমের কথা ভেবে। আশ্চর্য গাঢ় ঘুম হয়েছে।

গত কালকের তুলনায় বেশ কিছুটা স্বাভাবিক বোধ করবেন আজ। একদিনের অভিজ্ঞতা পেরিয়ে আসায় বেশ কিছুটা আত্মবিশ্বাসও এসে যাবে আপনার মধ্যে।

লক্ষ্য করবেন সামান্য হাসির কথায় অনেক বেশি হাসি এসে

যাচ্ছে আজ আপনার। তেমনি আবার সামান্য কিছুতেই সহজেই মেজাজ খারাপ হয়ে যেতে চাইছে। আপনার স্বাভাবিক ভাবাবেগ, যেটাকে চেপে রেখেছিল এতদিন সিগারেট—সেটা বেরিয়ে আসতে শুরু করেছে। একটু যদি মেজাজ খারাপ হয়ে যায়ও এ নিয়ে দুশ্চিন্তা করবেন না, কেটে যাবে দু'একদিনেই।

মাঝে মাঝে নিজের অজান্তেই সিগারেটের প্যাকেট খুঁজবে আজ আপনার হাত। যখন খেয়াল হবে যে সিগারেট নেই, খচ্ করে একটা খোঁচা লাগবে মনের মধ্যে। যত দ্রুত পারেন দূর করে দিন চিন্তাটা, অন্য কিছুতে মন দিন।

আজ রাতে যখন ঘুমাতে যাবেন তখন ভাবতে ভাল লাগবে আপনার যে পুরো আটচল্লিশ ঘণ্টা ধরে একটি সিগারেটও খাননি আপনি, অথচ তেমন কোন কষ্ট ত হয়নি। দুটো দিন পার করে দিয়েছেন আপনি। অনেকদূর এগিয়ে গেছেন।

তৃতীয় দিন

আজকে বেশ খানিকটা গর্ব এসে যাবে আপনার মধ্যে। তার মানে দুটো দিনে বেশ কয়েকটা প্রলোভন দমন করে নিজের ক্ষমতায় আস্থা আসছে আপনার, অনর্থক ভয় দূর হয়ে যাচ্ছে দ্রুত। গর্ব-বোধটা ভাল আপনার জন্যে।

আরেকটা অদ্ভুত ব্যাপার লক্ষ্য করবেন আজ। হাতে আজ অনেক বেশি সময় পাচ্ছেন। কেন যেন মনে হচ্ছে ঝটপট সব কাজ

হয়ে যাচ্ছে, তার পরেও অনেক সময় রয়ে যাচ্ছে আপনার হাতে। আজ আপনার ঘ্রাণ শক্তিও বেড়ে গেছে—হয়ত ইতিমধ্যেই লক্ষ্য করেছেন। আপনার শরীর থেকে দ্রুত বেরিয়ে যাচ্ছে নিকোটিন এবং অন্যান্য ক্ষতিকর বিষ।

আজকে আরো একটা ব্যাপার লক্ষ্য করবেন—অন্যের খাওয়া সিগারেটের ধোঁয়া আজ আর ততটা খারাপ লাগছে না। ঠিক না?

লজেন্স, চুইংগাম, আইসক্রিম, ইত্যাদির পিছনে ব্যয় করতে কার্পণ্য করবেন না—কারণ ভবিষ্যতে আপনি যত টাকা বাঁচাতে যাচ্ছেন, এ খরচ তার তুলনায় কিছুই নয়।

চতুর্থ দিন

আজকের দিনটা একটু সাবধান।

একের পর এক প্রলোভন দমন করে বেশ এগিয়ে যাচ্ছেন আপনি ধাপের পর ধাপ। কিন্তু আজ একটা কিছু সঙ্কট এসে উপস্থিত হতে পারে। হয়ত ব্যক্তিগত কোন সমস্যা, কিম্বা সিগারেটের তরফ থেকে একটা প্রবল প্রতি-আক্রমণ। বেশ একটু দুলিয়ে ছেড়ে দেবে আজ ব্যাপারটা আপনাকে।

সতর্ক থাকুন। কিছুতেই নিজেকে নরম হতে দেবেন না।

আসল সঙ্কটকাল পেরিয়ে এসেছেন আপনি। ভবিষ্যতেও সঙ্কট আসবে, কিন্তু ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে আসবে সমস্ত প্রলোভন।

যদি নিরাপদ মনে করেন আজ আপনিও একটু আক্রমণের

ভূমিকা গ্রহণ করতে পারেন। একটা ম্যাচ সঙ্গে রেখে বন্ধু-বান্ধবের সিগারেটে আগুন ধরিয়ে দিতে পারেন।

পঞ্চম দিন

প্রথম দিকে যে ঘোরের মধ্যে ছিলেন সেটা যেন কেটে যাচ্ছে আজ।

প্রথম দিকে যে আবিষ্কারের আনন্দ পাচ্ছিলেন সেটাও কেমন যেন ঝিমিয়ে এসেছে। সিগারেট না খাওয়াটা অনেকখানি স্বাভাবিক হয়ে এসেছে আপনার কাছে। না খাওয়ার উপকারগুলো প্রথম দিনে যতটা উৎসাহিত, রোমাঞ্চিত করেছিল ততটা যেন আজ আর করছে না।

কিন্তু প্রলোভন আসছে। মেজাজটাও আজকে যেন একটু বেশি ঘন ঘন খারাপ হচ্ছে।

যাই ঘটুক—কিছুতেই সিগারেট খাওয়ার ইচ্ছেটাকে ভিড়তে দেবেন না কাছে। আপনার তালিকাটা বারকয়েক পড়ুন আজ আবার। দুর্গের মত দুর্ভেদ্য করে ফেলুন নিজেকে। খুব সম্ভব আজই এ সপ্তাহের সবচেয়ে সঙ্কটের দিন। এটাকে পার করতে পারলেই অনেকটা ভাল বোধ করবেন আগামী কাল।

কারো সাথে রাগের মাথায় যদি দুর্ব্যবহারও করে বসেন, সেই লজ্জায় বিমর্ষ হয়ে আবার সিগারেটের আশ্রয় নিতে যাবেন না। স্মরণ রাখবেন, অনেক পরিশ্রম করে এই পর্যন্ত এসেছেন আপনি—এত প্রস্তুতি, এত কষ্ট হঠাৎ কোন দুর্বল মুহূর্তে আপনি বানের জলে

ভাসিয়ে দিতে পারেন না।

যতদূর এসেছেন তার জন্যে গর্বিত হওয়ার অধিকার আছে আপনার।

আজ একবার আত্মসম্মোহিত হয়ে সাজেশনের রেকর্ডিংটা শোনা ভাল।

আজকের দিনটা কাটিয়ে উঠলেই এ সপ্তাহের সবচেয়ে খারাপ দিনটা পার হয়ে যাবে।

ষষ্ঠ দিন

আজকের দিনটা বেশ সহজ ভাবে কেটে যাবে।

মাথাটা ঠাণ্ডা থাকবে। শান্ত একটা ভাব আসবে আপনার মধ্যে।

খুব সম্ভব সারাদিনে একটি বারও সিগারেটের ইচ্ছে জাগবে না আজ।

কিন্তু তবু সাবধান থাকা ভাল। বড় পাজি ধূমপানেব অভ্যাস।

আজ ইচ্ছে করলে নিজেকে পুরস্কৃত করতে পারেন। একটা সিনেমা দেখুন, পরিবারের সবাইকে নিয়ে চায়নিজ ডিশ খেয়ে আসুন, কিম্বা ব্যানানা স্প্লিট।

দেখবেন, নিজেকে এক প্যাকেট সিগারেট পুরস্কার দিয়ে বসবেন না যেন আবার!

সপ্তম দিন

আজকের দিন আপনার জয়ের দিন।

পুরো একটা সপ্তাহ পার করছেন আপনি বিনা ধূমপানে।

এখনো মাঝে মাঝে সিগারেট খাওয়ার ইচ্ছে হয়। কখনো কখনো খুব বেশি। কিন্তু ইচ্ছেগুলোকে দূর করে দেয়া এখন আপনার জন্যে অত্যন্ত সহজ কাজ। অভিজ্ঞ হয়ে গেছেন এ কয়দিনে।

তাছাড়া একবার ভেবে দেখুন ত, প্রথম তিনটে দিন কিসের মধ্যে দিয়ে পার হয়ে এসেছেন? এখন তার চেয়ে অনেক ভাল আছেন না?

এখন অন্য কেউ আপনার সামনে সিগারেট খেলেও কোন রকম ভাবান্তর হয় না আপনার মধ্যে। অনেক, অনেক সহজ হয়ে গেছেন আপনি।

আসল সঙ্কট কাল পার হয়ে এসেছেন। আগামী সপ্তাহে আরো অনেক সহজ হয়ে যাবেন।

মাঝে মাঝে খারাপ লাগবে। কিন্তু আগের মত নয়।

আপনার অতি-ভাবাবেগ, বদমেজাজ সব শান্ত হয়ে এসেছে। আরো হবে।

সব নিকোটিন বেরিয়ে গেছে আপনার শরীর থেকে। শরীরটা দ্রুত মানিয়ে নিচ্ছে নিজেকে বর্তমান ধূমহীন জীবনের সাথে।

যুদ্ধ শেষ হয়নি এখনো—কিন্তু ময়দানের পঁচাত্তর ভাগ শত্রু

সাফ করে দিয়েছেন আপনি ইতিমধ্যেই।

আজ আবার একবার আত্মসম্মোহিত হয়ে সাজেশনের রেকর্ড-টা শোনা ভাল।

অষ্টম দিন

আজ থেকে শুরু হল দ্বিতীয় সপ্তাহ—সহজতর সপ্তাহ।

নতুন জীবনে বেশ অভ্যস্ত হয়ে পড়েছেন আপনি। সেটা ভাল। সিগারেট না খাওয়ার আনন্দ উপভোগ করা খুবই ভাল কথা—কিন্তু সেই সাথে নিজেকে পূর্ণ মর্যাদাও দিতে হবে। এই অবস্থাটা কষ্ট করে অর্জন করেছেন আপনি—রাস্তায় কুড়িয়ে পাননি। কাজেই সব সময় একটা তুলনার মনোভাব থাকার দর-কার। অভ্যস্ত হয়ে পড়েছেন বলেই এই অবস্থাটা ডালভাত হয়ে যায়নি। আপনার তালিকাটা বের করুন আজ আর একবার—মিলিয়ে দেখুন, যখন সিগারেট খেতেন তখন কি কি অসুবিধে ছিল আপনার। উপলব্ধি করুন সিগারেট ছেড়ে দিয়ে কি কি বাজে জিনিস দুর করেছেন আপনি আপনার জীবন থেকে। অনেক কিছু অর্জন করেছেন আপনি এই কয়দিনে। অনেক কষ্ট করে।

নবম দিন

অসতর্ক হবেন না।

আপনার শত্রু কিন্তু কাছেই ওৎ পেতে রয়েছে। খুঁজছে আপনার দুর্বল মুহূর্ত।

সরাসরি আক্রমণ করে আপনাকে কাবু করা যাবে না, বুঝে নিয়েছে, তাই আজ থেকে ছল-চাতুরী শুরু করবে সে।

দেখবেন, আটদিন না খাওয়ার পর কেমন লাগে দেখার জন্যে একটান খেয়ে দেখতে যাবেন না। আপনি জানেন, খারাপ লাগবে। ব্যস। পাত্তা দেবেন না কোন প্রলোভনকেই।

দশম দিন

যদিও সবকিছুই আপনার নিয়ন্ত্রণে রয়েছে, তবু আজ আশা করতে পারেন হঠাৎ জোরাল একটা প্রলোভন এসে হাজির হবে আপনার সামনে। এতই হঠাৎ, যে চমকে যাবেন আপনি।

সিগারেট ছেড়ে দেয়ার ভাল দিকগুলো সবসময় স্মরণ রাখা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। বিশেষ করে ভালতে যখন অভ্যস্ত হয়ে পড়েছেন আপনি, তখন। আপনার প্রতিরোধ একটু আলগা হয়ে যাচ্ছে সেজন্যেই। তাছাড়া সিগারেট খাওয়ার প্রবল ইচ্ছের সাথে

আপনি পরিচিত, কিন্তু শত্রুর কৌশল এবং ছল-চাতুরী সম্পর্কে ততটা অভিজ্ঞতা হয়নি এখনো আপনার।

সেই সুযোগটা নেয়ার চেষ্টাই করবে আপনার শত্রু।

এমন এক উদ্ভট সময়ে অপ্রত্যাশিত ভাবে আশ্চর্য কোন প্রলোভন নিয়ে হাজির হবে যে প্রথমে বুঝতেই পারবেন না ব্যাপারটা কি ঘটছে। যখন বুঝতে পারবেন, তখন দেখবেন বেশ কিছুটা ভাবনা-চিন্তা শুরু করে দিয়েছেন আপনি সিগারেট সম্পর্কে, নিজের অজান্তেই। টের পাওয়া মাত্র থামতে হবে আপনার। নইলে ধূমপানের একটা তীব্র ইচ্ছে আপনার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে আপনাকে চিৎ করে দেয়ার চেষ্টা করবে। আগামী চারটে দিন এদিক থেকে সতর্ক থাকতে হবে আপনার।

ঝেঁটিয়ে দূর করে দিন ইচ্ছেটা। সাজেশনের রেকর্ড শুনুন। লিস্ট বের করে আবার একবার ঝালিয়ে নিন সিগারেট ছাড়ার কারণগুলো।

চতুর্দশ দিনের ঠিক রাত বারটার সময়ে যে আপনার সিগারেট খাওয়ার সমস্ত ইচ্ছে দূর হয়ে যাবে, তা নয়। এই চোদ্দ দিনে সিগারেটের সব রকমের আক্রমণ প্রতিহত করবার মত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা হয়ে যাবে আপনার। তারপর জয় আপনার সুনিশ্চিত।

একাদশ দিন

আজ আপনি বন্ধু-বান্ধব যারা বলেছিল খামোখা চেষ্টা করছেন, সিগারেট ছাড়তে পারবেন না, তাদের সাথে একটু মোলাকাত করে

আসতে পারেন। অন্ততঃ একজনকে ধরে আজ আপনার বলা উচিত, 'কি হে, বলেছিলে না ছাড়তে পারব না?' ছেড়ে দিয়ে কেমন বোধ করছেন সেটা জানাতেও ভুলবেন না।

আপনাকে আক্রমণাত্মক হওয়ার পরামর্শ দিচ্ছি না, আজ আপনার আত্মপ্রতিষ্ঠা দরকার, নিজেকে একটু জাহির করা দরকার। কেন করবেন না? দশটা দিন পার করেছেন আপনি সিগারেট ছাড়া। সোজা কথা?

আপনার বন্ধু যদি বলেন, 'বাছা, মাসখানেক পরে এসে এসব শুনিয়ো,' সাথে সাথেই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করবেন আপনি। এক মাস কেন, এক বছর পরেও যেন এই কথাই বলতে পারেন সেই মানসিক প্রস্তুতি নিয়ে ফেলুন। আপনার ঈষৎ ঈর্ষান্বিত বন্ধুর কাছে যেন কোন অবস্থাতেই ছোট না হতে হয় সেই প্রতিজ্ঞা নিয়ে ফেলুন। এটা আপনার প্রয়োজনে আসবে। ভুলবেন না দয়া করে।

যাই হোক, আজ একাদশ দিনে কেমন বোধ করছেন? ভাল ঘুম হচ্ছে না? খাবারের স্বাদ বেড়েছে না? শারীরিক উন্নতি উপলব্ধি করতে পারছেন না? মিথ্যা বলেছিলাম?

খুকখুক কাশি কোথায় গেছে? বুকের কফ? আর ঐ যে বলেছিলেন, ডিসপেপশিয়া না কি যেন একটা ছিল—কোথায় গেল সেটা?

দ্বাদশ দিন

ধূমপানের ইচ্ছেটা ধীরে ধীরে কমে যাবে বলেছিলাম, কথাটার সত্যতা উপলব্ধি করতে পারবেন আজ আপনি। কিন্তু সেই সাথে সাবধান করে দিচ্ছি—আজ, কাল বা পরশু এই তিনদিনের মধ্যেই আর একটা তীব্র সঙ্কট এসে হাজির হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

এবার সূক্ষ্ম চাল চালবে আপনার শত্রু। এমন আবছা ভাবে আসবে আক্রমণ যে বেশ কিছুক্ষণ টেরই পাবেন না। স্ত্রীর সাথে ঝগড়ার সুযোগেই আসুক, বাচ্চার বেয়াড়াপনার সুযোগেই আসুক, চাকরি বা ব্যবসাক্ষেত্রে কোন গোলমালের সুযোগেই আসুক—আসবে একটা আক্রমণ। শুরুটা হবে সামান্য কোন কিছু নিয়ে, বেড়ে উঠবে ধীরে ধীরে।

নিজের প্রতি করুণার ছল ধরে আসতে পারে আক্রমণ।

হঠাৎ মনে হবে: কেন ছেড়ে দিলাম সিগারেট? সত্যিই ত, তেমন কিই বা সুবিধে হচ্ছে না খেয়ে? অন্যেরা বেশ ত টেনে যাচ্ছে মহাফুর্তিতে, ওদের কোন ক্ষতি হবে না, সব ক্ষতি আমারই হবে? মদ না, নারী না, জুয়ো না—এই একটা মাত্র আনন্দ ছিল আমার, কেন বঞ্চিত করছি নিজেকে। কেন কষ্ট করছি অনর্থক? অতিরিক্ত না খেলেই ত হল? না হয় দিনে পাঁচটাই খাব—তবু একেবারে না খাওয়ার চেয়ে, নিজেকে বঞ্চিত করার চেয়ে, হা-

হুতাশ করে কষ্ট পাওয়ার চেয়ে সেটা অনেক ভাল। টাকা বাঁচছে—কেন, সিগারেটের পয়সা যোগাবার ক্ষমতা নেই বুঝি আমার? এতই অথর্ব হয়ে গেছি যে এটুকুও পারব না? এরকম আরো অনেক যুক্তি আসতে চাইবে মনের মধ্যে।

এ সমস্তই বাজে যুক্তি। একটু ভাবলেই বুঝতে পারবেন আপনি ফাঁকটা। এই বইয়ের গোড়ার দিকের কয়েকটা পরিচ্ছেদের কথা স্মরণ করুন। কিম্বা পাতা উল্টে চোখ বুলিয়ে নিন। নিজের তালি-কাটা বের করে ভাল করে একবার পড়ে দেখুন। তাহলে নিশ্চয়ই বুঝতে পারবেন কেমন ভিত্তিহীন বাজে যুক্তি ঐসব?

মুশকিল হচ্ছে,—প্রলোভনটা যখন দুঃখী, বিষণ্ণ ভাব নিয়ে নিজের প্রতি করুণার ছদ্মবেশে আসে, তখন সিগারেট ছেড়ে দেয়ায় কোন্ দোজখ থেকে যে আপনি বেরিয়ে এসেছেন সেটা আর খেয়াল থাকে না। মনে থাকে না, যেসব ধূমসেবীকে আজ হঠাৎ আপনার ঈর্ষা হচ্ছে তারা আসলে মহানন্দে, মহা ফূর্তিতে সিগা-রেট খাচ্ছে না। আপনিও এক সময় সিগারেট খেতেন—মহা ফূর্তিতে সিগারেট খেতেন না নিশ্চয়ই? আসলে ওরা একটা কু-অভ্যাসের নিগড়ে বন্দী। আপনিও ছিলেন। ওরা ছাড়তে পারেনি। আপনি পেরেছেন!

কাজেই, দোহাই আপনার, এসব জোলো কথায় ভুলবেন না। অনুশোচনা বা নিজের প্রতি করুণার ভাব আসতে চাইলেই জান-বেন বিপদ আসছে। এক ঝটকায় বেরিয়ে আসতে হবে ওর মধ্যে থেকে। মনটা অন্যদিকে ঘুরিয়ে নিন, জোরে জোরে শ্বাস নিন তিনবার। বইটা উল্টেপাল্টে দেখুন। আবার একবার আত্মসম্মো-

হিত হয়ে সাজেশনের রেকর্ডটা শুনুন।

একে একটু লাই দিলেই মাথায় উঠে বসবে। আপনার এতদিনের কষ্ট সব পানিতে যাবে। লাথি মেরে দূর করে দিন এই সব চিন্তা।

ত্রয়োদশ দিন

আজ একটা সিগারেটের দোকানে যেতে হবে আপনার একটু কষ্ট করে।

দোকানে থরে থরে সাজান সিগারেটের প্যাকেটগুলো ভাল করে লক্ষ্য করে দেখুন। সম্ভব হলে ঘৃণার দৃষ্টিতে। তারপর চোখ ফিরিয়ে নিয়ে চলে আসুন।

যারা এখনো এই সাজানো পসরার ক্রেতা, পয়সা দিয়ে যারা ওসব কিনে ধোঁয়া করে উড়িয়ে দিচ্ছে তাদের জন্যে করুণা বোধ করুন।

চতুর্দশ দিন

কেমন বুজতাছেন ?

আজ আপনার সিগারেট ছেড়ে দেয়ার চোদ্দদিন পূর্ণ হতে চলেছে।

শেষ পর্যন্ত জয়ী হয়েই ছাড়লেন। ঠেকান গেল না আপনাকে!

এর পরেও মাঝে মাঝে ইচ্ছে আসবে না, তা নয়। প্রলোভন আসবে। কিন্তু গত চোদ্দদিনে আপনি যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন, আপনাকে পরাজিত করা এখন সিগারেটের ক্ষমতার বাইরে। আপনি নিজে যদি ঢিল দেন, যদি অসতর্ক অবস্থায় সুযোগ দেন শত্রুকে, প্রশ্রয় দেন প্রলোভনকে, তাহলে কেউ আপনাকে রক্ষা করতে পারবে না। কিন্তু সেটা আপনি করবেন না। চোদ্দটা দিন ত নয়, যেন চোদ্দটা বছর যুদ্ধ করেছেন আপনি, এখন পরাজয় বরণ করবার প্রশ্নই ওঠে না।

এইবার নিজেকে ভাল কিছু প্রাইজ দিয়ে ফেলুন। দুই সপ্তাহে কতটাকা জমিয়েছেন? সত্তুর? না একশো চল্লিশ? এর সাথে আরো অতটাকা যোগ করে ভাল কিছু কিনে প্রেজেণ্ট করুন নিজেকে। খরচটা বেশি হয়ে যাচ্ছে? মোটেও না। এতদিনে যা জমিয়েছেন, আগামী চোদ্দদিনে আরো অতগুলো টাকা জমবে আপনার। সিগারেট খেলে ত ধোঁয়া হয়ে উড়েই যেত। এত বড় একটা যুদ্ধ জয় করলেন, সারা জীবনের জন্যে মুক্ত হলেন এক ভয়ঙ্কর বদভ্যাসের নাগপাশ থেকে—কাজেই ভাল কিছু প্রেজেণ্টেশন আপনার ন্যায্য পাওনা।

প্রলোভন এলে জোরের সাথে মোকাবিলা করুন। মাঝে মাঝে এই বইয়ের পাতা উল্টে চোখ বুলান। সাজেশনের রেকর্ডটা শুনুন। এখন আপনি সুনিশ্চিত বিজয়ের পথে চলেছেন। শুধু স্মরণ রাখবেন, ভুলেও সিগারেট খাবেন না। একটাও না। একটানও না।

এখন আপনি নির্ভয়ে বুক চাপড়ে বলে বেড়াতে পারেন, ছেড়ে দিয়েছেন আপনি সিগারেট।

কথা দিয়েছিলাম, ছেড়ে দেয়ার ইচ্ছে থাকলেই পারবেন আপনি ছাড়তে।

এবার খুশি ?

শুভেচ্ছা জানিয়ে বিদায় নিতে পারি তাহলে ?

।। সমাপ্ত ।।